মন্থন

সঙ্গিনী

অমরেন্দ্র ঘোষ

॥ নবভারতী ॥ ৬, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ১২ ॥

প্রথম সংস্করণ
আগস্ট—১৯৫৪

প্রকাশক :
সুনীল দাশগুপ্ত
নব ভারতী
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ
সমীর সরকার

ছেপেছেন
শ্রীশরৎ দাশ, বি, এ
মডার্ণ প্রিণ্টিং সার্ভিস
কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ভারত প্রেস
২২/১/এ ডিক্‌সন্ লেন
কলিকাতা—১৪

পাকিস্তান প্রাপ্তিস্থান
বই ঘর
ফিরিঙ্গি বাজার রোড
চট্টগ্রাম

দাম—তিন টাকা

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ

শ্রদ্ধাষ্পদেষু

॥ লেখকের অন্যান্য রচনা ॥

চর কাশেম
পদ্মদীঘির বেদিনী
দক্ষিণের বিল (১ম ও ২য় খণ্ড)
ভাঙছে শুধু ভাঙছে
বে আইনি জনতা
একটি সংগীতের জন্ম কাহিনী
কনকপুরের কবি
জোটের মহল
একটি স্মরণীয় রাত্রি (যন্ত্রস্থ)
এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ (নাটিকা, যন্ত্রস্থ)
একটুখানি নুন (যন্ত্রস্থ)
কুলায় প্রত্যাশী (যন্ত্রস্থ)
কলের নৌকা (যন্ত্রস্থ)

এক

সপ্তাহের একটি মাত্র দিন। দূর দূরান্তর পর্যন্ত সাড়া পড়ে যায়। ভোর না হতেই যেন একটা গঞ্জ গড়ে ওঠে বোলতলী। দুটো নদীর সঙ্গম স্থলে অফুরন্ত নায়ের মিছিল। সোমবার ছাড়া সারা সপ্তাহ এ জায়গাটা খালি পড়ে থাকে। কোথায়ই বা এত নৌকা, কোথায়ই বা এত মানুষ? যেন আরব্য রজনীর পর্দা সরে যায় এই নির্দিষ্ট দিনটিতে।

সারা দিন ধরে নদীর জল, পার ও কিনার গমগম করে—ডোঙা-ডিঙি-পান্‌সী-সাত-মাল্লাই-মাল-টানা কাঠামি। মানুষ আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। বাঁকে বাঁকে নৌকার বহর—নানা ঢকের নাও। বোলতলী হাটবারে চারদিকের গ্রামগুলো'র তেজারতের ব্যাংক হয়ে দাঁড়ায়। যে না দেখেছে সে কিছুতেই অনুমান করতে পারবে না—কি অদ্ভুত লেন-দেন। চাল ডাল নারকেল সুপারি পান তামাক—নানাবিধ কাঁচা মালের চেক এখানে ক্যাশ হয। অদল বদল ওভার-ড্রাফটও চলে সহুরে ব্যাংকের মত। অগ্রিম কবালা-পাট্টার টাকা পয়সাও আদান প্রদান হয় এখানে বসে।

অতএব সোমবার একটি স্মরণীয় দিন এ অঞ্চলের উত্তম অধম সমস্ত বাসিন্দাদের কাছে।

এমনি একটি সোমবার গত হয়ে যায়।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে নদীর জলে। একখানা ডোঙা নৌকা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি পথ থেকে।

'মিতা!'

'কি?' যে মন্মথর ডাকে অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দেয় তাকে হঠাৎ দেখলে কংকাল বলে ভ্রম হয়।

'সন্ধ্যে হয়ে গেছে, এসো আর দেরি না করে এই মুড়ি ক'টা ভাগ করে খাই।'

'না, না তুমি খাও। ঐ কয়ডাই তো মুড়ি:!'

'উঁহু, সে হয় না—একা আমি খাবই না।' মন্মথর টানে অগত্যা অপর ব্যক্তি এগিয়ে আসে।

বৈঠা তুলতেই ছোট ডোঙা নৌকা নদীর জলে চরকির মত গোটা কয়েক ঘুরপাক খায়। তারপর ঘুরতে ঘুরতেই ভাটিয়ে চলে।

দুজনে এই মাত্র হাট থেকে বাড়ি ফিরে চলেছে। মন্মথ 'ভাসান-দোকানী'। আব্বাস চোর।

মন্মথের জমা মাত্র পাঁচ সিকা। তাই দিয়ে সে হাট থেকে দু কাঠি ধান কিনে এনেছে।` কার্তিক দল ধান। ঐ ধান ভেনে চাল হবে, সেই চাল ভেজে তবে মুড়ি। সেই মুড়িতে সস্তা গুড়ের ভিয়ান দিয়ে সে আগামী সোমবার হাটে নিয়ে যাবে, যেমন সে আজও নিয়ে গিয়েছিল। 'মুড়ি চাই, চাই টাটকা গুড়ের মুড়ি' এমনি সারা দিন ধরে রোদে পুড়ে গলাবাজি ক'রে, ডোঙা নাও বেয়ে সবখানি মালই সে চালিয়েছে। মুনাফাও কিছু হয়েছে। কিন্তু তা

দিয়ে খোরাকীর যে চাল সে কিনে এনেছে তাতে সপ্তাহ কুলাবে না—সওদাপাতি বলতে একটু নুনও খরিদ করতে পারেনি।

তাই সৌদামিনীর মুখ ভার।

আর আব্বাসের কথা কি বলব—সেও রাত থাকতে উঠে বন্ধুর সংগে এক নৌকায়ই হাটে গিয়েছিল। সারা সপ্তাহ ধরে সে কাজ পায় নি। দিন মজুর, দৈনিক তার খাটুনির প্রয়োজন, প্রয়োজন কিছু অর্থের, কিন্তু গত সপ্তাহটা তার একেবারে বেকার বসে কাটাতে হয়েছে। তবু সংসার তাকে ছাড়ে নি। ভাই হাত কেটেছে, বুকের খানিকটা ছড়ে গেছে, পাযে ফুটেছে গোটা কযেক ধারাল কাঁটা। সে গত রাত্রি ভরে মানুষের বাগানের কচু কলা নারকেল লাউ চুরি করেছে। কখনও তাড়া খেযে কুমোর বাড়ির খোলামকুচি ভরা পগারে পড়েছে, কখনও নাপিত বাড়ির বেতের ঝাড়ে জড়িয়ে গেছে—এমনি ধারা হাজারো ঝকমারি করে সে যা সংগ্রহ করে হাটে নিয়ে গিয়েছিল তার কোনটা ডাঁসা, কোনোটা টুসটুসে পাকা, কোনটা নিতান্তই কচি।

এত অসামঞ্জস্য দেখে কত লোক তো তাকে সন্দেহই করেছে। কিন্তু তার তেল কুচকুচে ছেঁড়া গামছার অন্তরালের ঐ শীর্ণ দেহ, কোটরাগত ঘোলা চোখের ঐ মলিন দৃষ্টি দেখে কেউ কিছু আর বলতে সাহস পায়নি।

খদ্দের নেই, মহা মুস্কিল! আব্বাস একেবারে ঘেমে ওঠার জোগাড়। তার হাত পা একেবারে টনটন করছে। সে খানিক বসে খানিক দাঁড়িয়ে কাটাতে থাকে। সন্ধ্যার একটু আগে সে অনেক

অনুনয় বিনয় করে একজন খদ্দেরকে মাল গছায়। 'নিয়া যান মিঞা, আপনে লক্ষ্মীবন্ত গেরস্থ, আপনার ঘরে কত লোক, খাইয়া দোয়া করবে।'

'তোমার দোয়ায় এ সব আমার ঘরের লোকে খাবে কেন? পাঠাব বিলে যেখানে আমার হাল চলে দশ খান—ঠিকা কৃষাণ আছে পঁচিশ জন।'

লক্ষ্মীবন্ত মানুষটি মিষ্টি কথা বলে, কিন্তু দাম কষায় যতদুর কষানো যায়।

আব্বাস একটা নিশ্বাস ছাড়ে।

আব্বাসও চাল কিনে এনেছে, বেসাতি এবং তরিতরকারী এনেছে দোকানীদের কাছ থেকে খয়রাত চেয়ে, আর কিছু এদিক-ওদিক করে। কিন্তু তাতেও তার সপ্তাহ কুলাবে না—তবু তার স্ত্রী আজ খুশি, খুশি ছেলে মেয়েগুলো। কারণ আজ তো তারা পেট ভরে খাবে। আগামী কালও তারা নিশ্চিন্ত। তারপর কি হবে সে ভাবনা এখন ভেবে মন অস্থির করে লাভ কি? তাই সখিনা তাড়াতাড়ি প্রদীপের শুকনা পলতেটাই কোন রকমে জ্বালায়। ভাত রেঁধে, বিনা তেলেই লংকা রসুন দিযে কটকটে করে খানিকটা ছালুন সম্ভার দেয।

উলংগ ছেলেমেয়েগুলো ধেই ধেই করে নাচতে থাকে।

ঠিক আব্বাসের মতই মন্মথ না খেয়ে হাটে গিয়েছিল। সৌদামিনী সব জানে—জানে যে কত কষ্ট হযেছে তার স্বামীর তবু যতটা তাড়াতাড়ি ক'রে তার রান্না চড়ান উচিত ছিল তা সে করেনি। নুন কোথায়, তেলই বা কই? আবার সে যাবে অন্য ঘরে ধার করতে? আজ আবার হাটবার গেল। কি কথা বলে ধার

আনবে? ফুরিয়ে গেছে? তবে আজ আনল না কেন মন্মথ? যে ভাবেই বলুক—বলতে হবে অক্ষমতার কথা। গ্লানিতে তার মন ভরে ওঠে। তারাই এ বাড়ির বড় সরিক, অথচ তাদেরই অভাব বেশি।

এককালে সৌদামিনীর বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল ছিল—শ্বশুর বাড়ির অবস্থাও নিতান্ত মন্দ ছিল না। সে সব কথা মনে প'ড়ে আজ তার দুঃখ হয়। আবার দুঃখ হয় স্বামীর দিকে চাইলে। কি চেহারা কী হয়েছে! তার স্বামী ধূর্ত নয়, ধড়িবাজ নয়, সরল সাধারণ মানুষ। শক্তি এবং সামর্থ্যে তার যা কুলায় সে তা সংসারের জন্য করে। তবু পোড়া সংসার ফাঁপে না। এর জন্য দায়ী সৌদামিনীর অদৃষ্ট। স্ত্রীভাগ্যে ধন, পুরুষের ভাগ্যে জন। এমনি কত কি ভাবতে ভাবতে তার কাজে দেরি হয়ে যায়।

মন্মথ বলে, 'তা হয়েছে কি—হ'ক না ধীরে ধীরে। এখন তো আর হাটের তাড়া নেই।'

ছেলে মেয়েগুলো না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

হাজার অপমান বোধ হলেও সৌদামিনীকেই অন্য সরিকের ঘরে গিয়ে নুন তেল চেয়ে আনতে হয়। এবং সে যখন রান্না শেষ ক'রে মন্মথকে ডাকতে আসে তখন বাড়ির ওপরের সব ঘরের প্রদীপ নিবেছে—মন্মথ দাওয়ার ওপর গামছা বিছিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে।

সৌদামিনীর ডাকে মন্মথ ধড়মড় করে উঠে বসে। 'চলো যাই, সত্যিই তো রাত হয়ে গেছে অনেকটা, খাওয়া প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, ছেলে মেয়েগুলোও ঘুম ভেঙে উঠে খেতে বসেছে। ছোটটা বাধাল গণ্ডগোল, কেমন করে যেন একটা লংকা চিবিয়েছে।

'একটু মিষ্টি এনে দাও—যাও শীগগির। ওটার মুখ একেবারে লাল হয়ে উঠেছে।'

'মিষ্টি পাব কোথায়?'

'কেন, একটা গুড়ের ঠোঙা পাওনি?'

'আমার কপাল লো—এমন অদেষ্টও আমার যে হাট থেকে আসবে গুড়! নুনই আসে বিস্তর!'

আর কিছু প্রতিবাদ করতে সাহস হয় না মন্মথর। সে সত্যই প্রায় দেড় সের গুড় কিনে এনেছিল। যদি কথাটা নিয়ে বেশি আলোচনা হয় তবে হয়ত সৌদামিনী আরও ক্ষেপে উঠবে। সে তো সর্বদাই আব্বাসের সংগ ত্যাগ করতে বলে।

সৌদামিনী ছেলেটার মুখ ধুইয়ে একটা পাকা কলা চটকে খাইয়ে দেয় তাড়াতাড়ি।

কি আশ্চর্য মানুষের মন। এই আব্বাসের জন্য মন্মথ কী না করে! এমন কি তার বামাল বিক্রির সহায়তা পর্যন্ত সে করে দেয়। ধরা পড়লে তার যা হবে তা মন্মথ জানে। অথচ ওর ওপরও সে ঘা দিতে ছাড়ে না। এতদিন পরে মন্মথ বুঝল চোরের মা-মাসী জ্ঞান নেই।

এই আব্বাসকে সে অনেক বুঝিয়েছে। আব্বাস নীরবে কান পেতে সমস্ত উপদেশ শুনেছেও। তখন মনে হয়েছে, না—স্বভাব বুঝি ফিরল এবার। কিন্তু সময় মত যে-ই পাগল সে-ই ঠিক। বলে যে, কাজ পাইনে, কাজ করায় কে?

মন্মথ রাগ করে নিজেই দু'তিনবার দু'তিন জায়গায় কাজ ঠিক করে দিয়েছে। এবার আব্বাস জবাব দেয় যে, সে তো সারাদিন কাজ করে এলো কিন্তু পয়সা তো তারা এখনও দিল না। ওয়াদা

করেছে সোমবার নাকি হাটে বসে দেবে।' কিন্তু এখন চলবে কি করে? সোমবারের তো ঢের দেরি।

আব্বাস দাওয়ায় উঠে শক্ত হয়ে বসে।

মন্মথ মহা বিব্রত হয়। সে একি দায় ঠেকল! সৌদামিনী ঘর ছেড়ে উঠানে নেমেছে তুলসী তলায় ও মণ্ডপে সন্ধ্যা প্রদীপ দেখবে বলে। মন্মথ উঠে চোরের মত ঘরে ঢোকে। এবং এক সের চাল এনে আব্বাসের হাতে দিয়ে বলে, 'যাও, যাও এবার ওঠো। সোমবার শোধ করে দিও মিতা।'

'আচ্ছা—চিন্তা কইরো না।'

সোমবার আসে, মন্মথর হাত টানাটানি—উসখুস করে কিন্তু আব্বাসকে কিছু বলতে পারে না। হাটের শেষ পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে বসে থাকে।

আব্বাস সওদার ডালা নিয়ে ফেরে, কিন্তু এমন তার মুখের ভাব যে তাকে আরও কিছু দিলে ভাল হয়।

মন্মথ চুপ করেই বাড়ি ফেরে—সৌদামিনীর সেই মুখ ভার।

তবু মন্মথ আব্বাসকে ভালবাসে। কতবার যে এমন ঠকেছে, তবু শৈশবের মিতাকে সে ভুলতে পারে না। ভুলতে পারে না তার শীর্ণ মুখ—বিষণ্ণ চোখের চাহনি।

কেন জানি আব্বাসও জড়িয়ে থাকে মন্মথকে। যখন তখন এসে এটা-ওটা বেগার খেটে দিয়ে যায়। হয়ত এক এক দিন সন্ধ্যা হয়ে যায় ঘরের বেড়া বাঁধতে নয় তো রান্না ঘরের চাল ছাইতে কিন্তু আব্বাস কাজটুকু পরিপাটি মত না করে দিয়ে বাড়ি ফেরে না। সেদিন মন্মথ কিছু দিতে গেলে আব্বাস বলে, 'তোবা, তোবা!'

সেই আব্বাসই চুরি করল গুড়ের ঠোঙা!

সকাল বেলা উঠে মন্মথ হিসাব করে দেখল এ সপ্তাহেই তাকে নতুন একটা কাজের সন্ধান করতে হবে নইলে মুড়ি বেচে আর সংসার চলবে না। পাঁচ সিকা জমার তো প্রায় তিন আনা ঢিল হয়েছে গুড়ে, বাকি জমাটাও প্রায় ঢিল হবে চালে।

ভাগ্যক্রমে হঠাৎ একটা কাজও জুটে গেল—মাধাই সোমের চালের নৌকায় কয়ালী অর্থাৎ কিনা দালালী। কাজটা অতি সহজ। নৌকায় চড়ে হাটে হাটে যাবে, দেখে শুনে সে চাল কিনে দেবে। ডালা প্রতি এক আনা মজুরী। মাধাই প্রস্তাব করা মাত্র মন্মথ রাজী হয়ে গেল।

যাওয়ার সময় মন্মথ অনেক উপদেশ দিয়ে গেল আব্বাসকে। সে যেন তার স্বভাবটা বদলায়। ইচ্ছা থাকলে পথ হয়। একটু যেন খেটে-খুটে খায়। ইত্যাদি ইত্যাদি…

আর বিশেষ করে বলে গেল তার বাড়ি ঘরটা দেখা শুনা করতে। কিছু সওদা বেসাতি লাগলে 'মিতাইনকে' এনে দিতে। তার ভরসাই সব ফেলে সে বিদেশে যাচ্ছে। বাড়ির ওপর যারা আছে তাদের দিয়ে কোন উপকারের আশা নেই। কারণ সবার-ই হিংসা হয়েছে মন্মথর এই আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তনে।

আশ্চর্যের বিষয় মন্মথ নৌকায় ওঠার সময় খাল পারে শঠি বনের মধ্যে সেই গুড়ের ঠোঙাটা পায়।

সে সৌদামিনীর হাতে দিয়ে বলে, 'এই নাও। কি ভেবেছি আর কি হয়েছে!'

দুই

মন্মথ চলে গেছে।

আব্বাস যেখানেই থাক দিনের ভিতর অন্তত একবার এসে খোঁজ খবর নিয়ে যায় সৌদামিনীর। টুকিটাকি কাজ কর্ম থাকলে তা করে দিয়ে যায়। কোন দিন রাত হয়ে যায় তবু সে কাজ শেষ না করে বাড়ি ফেরে না। কাঠ ফাড়া, গাছ থেকে নারকেল পাড়া, সওদা সামগ্রী এনে দেওয়া, এসব সাহায্যই সে 'মিতাইনকে' করে।

সৌদামিনী সন্দেহের চোখে না দেখে পারে না—কিন্তু আব্বাস তা বোঝে না। যেদিন সে মাছ ধরে, সেদিনও তিন ভাগের এক ভাগ মিতার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যায়। বাকিটা সে গাঁয়ের ভিতর বিক্রি করে চাল জোগাড় করে।

ছেলে মেয়েরা আব্বাসকে দেখলেই 'চাচা চাচা' করতে থাকে, আর করতে থাকে ফরমাশ—এটা পেড়ে দাও, ওটা করে দাও, সেটা এনে দাও।

আব্বাস বিরক্ত হয় না। মন্মথর ভাগ্য পরিবর্তনের সংগে সংগে তারও নাকি বরাত ফিরেছে—কাজ কর্ম পাচ্ছে যথেষ্ট। এখন বন্ধুর বাড়ি বেগার দেয় বেশ আনন্দের সংগেই। ছেলে মেয়েদের সংগে রহস্যালাপে দু একদিন বেশ রাতও হয়ে যায়।

কিছুদিন বাদে মন্মথ টাকা পাঠায়। দৈবক্রমে সেই রাত্রেই তার ঘরে চোরে সিঁধ কাটে। টাকাকড়ির সংগে দু একখানা বাসন কোসন যা ছিল তাও চোরে নিয়ে যায়।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই সৌদামিনীর হাহাকার শোনা যায়।

পাড়া-প্রতিবেশীরা ভেঙে পড়ে, 'কি হয়েছে? কি হয়েছে? হঠাৎ কোনো দুঃসংবাদ আসেনি তো? ভাল আছে তো মন্মথ?'

ঘরের মেটে ডোয়ায় প্রকাণ্ড একটা সিঁধ কাটা। মানুষ যাতায়াত করতে পারে অনায়াসে। ঘর দোর সব পরিষ্কার। মায় পান্তা ভাত সমেত মেটে হাড়িটা পর্যন্ত।

জ্ঞাতিদের মনে বেশ একটু আনন্দ হয়। কিন্তু মুখে তারা আহা উহু করে। 'কে এমন সর্বনাশ করলে? এমন নেমকহারাম বেইমান কে?'

'বুঝলে না নিবারণ—আর কে! এত বেগার ফুট-ফরমাস কি এমনি কেউ খাটে? এত জ্ঞাতি গোষ্ঠী কাছে থাকতে তাদের না ডেকে খাল কেটে কুমীর আনলে এই দুর্দশাই হয।'

সময় মত চৌকিদার, দফাদার আসে। সৌদামিনীকে এজাহার দিতে থানায় যেতে হয়। তাকে জ্ঞাতি গোষ্ঠীরা যা শিখিয়ে দেয, তাই তোতা পাখির মত মুখস্থ বলে। খামাকা দু' একটা ধমক ও ছাড়েন থানা-অফিসার।

ক্ষুধা, তৃষ্ণায, উদ্বেগে মাথা ঘুলিযে যায় সৌদামিনীর। সে একজন অতি সামান্য গৃহস্থ বধূ—এমন বিপদেও তাকে ঈশ্বর ফেলেছেন! মাল-মাত্তা যা যাওযার তা তো গেছে, যাক—এখন ইজ্জৎ নিয়ে ফিরতে পারলে হয।

দু তিন দিন বাদে পুলিশ আসে। ভাল করে সব খোঁজ খবর নেয়। সৌদামিনীকেই ডাকে প্রথম।

'মন্মথ কোথায়?'

'সে তো হুজুর—'

'তুই কেরে শালা ?'

'আমি তার বড় খুড়োর ছেলে।'

'এখন বেটা আত্মীয়তা ফলাতে এসেছেন—বড় খুড়োর ছেলে! বলি যখন চুরি হয় তখন ঘুমিয়ে ছিলেন কোন শিয়রে? নিশ্চয় তোদের যোগসাজোস আছে চোরের সংগে।'

'বলতে পারেন, আপনি হচ্ছেন এ তল্লাটের মালিক।'

'শুধু বলা নয়, তোমরা এত সব আত্মীয়-স্বজন থাকতে চুরি হল কি করে—বেঁধে চালান দেব দল সমেত। যত সব চোরের তল্পীদার!'

সকলে চুপ করে থাকে।

সুযোগ পেয়ে দারোগা সতৃষ্ণ নয়নে সৌদামিনীর দিকে তাকায়। 'মন্মথ কতদিন বিদেশে ?'

একটু ঘোমটা টেনে সৌদামিনী জবাব দেয়, 'প্রায় মাসখানেক।

'তা বেশ, বেশ! বলে যাও।'

কি ছাই বলবে, সৌদামিনী চুপ করে থাকে।

'আব্বাস কি রোজ রাত্তিরেই আসে? এই মানে, চুরি হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত? বল বল লজ্জা করো না।'

সৌদামিনী মুখ খোলে না?

'এত লজ্জা করলে কি চোর ধরা পড়ে? রোজই কি আব্বাস এখানে আসে?'

সৌদামিনী ঘর্মাক্ত হয়ে জবাব দেয়, 'হুঁ'।

আর আব্বাস যায় কোথায়? যেখানে কাজ করছিল সেখান থেকে তাকে পিঠ-মোড়া বাঁধন দিয়ে ধরে নিয়ে যায়। সৌদামিনীর

ছোট্ট চার বছরের ছেলেটা শুধু হাঁস-ফাঁস করতে থাকে। 'চাচাকে মারে কেন, দিদি চাচাকে ওরা বাঁধল কেন?' রাত্রে ঘুমাবার আগ পর্যন্ত শিশু উত্তেজিত হয়ে বারবার ঐ এক প্রকার সহস্র প্রশ্নে সকলকে অতিষ্ঠ করে তোলে।

বাড়ির ওপরের হিংসুক জ্ঞাতিরা সুখী হয়। এখন থেকে তারাই সৌদামিনীর সওদাপাতি এনে দেবে। হাট বাজারের জন্যও ঠেকবে না। পয়সা থাকলে কি জনের অভাব?

তিন

শোকের চেয়ে শংকায় আব্বাসের স্ত্রী সখিনাকে বেশি কাবু করে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখন সে কি করবে? ঘরে কিছু নেই যে বেচবে কিংবা বন্ধক রাখবে। বাড়ির ওপরের গাছ-গাছালিতে হাত দেওয়া যাবে না। সরিকেরা রাজী হবে না ফলন্ত গাছপালা বেচতে। সে কচুর শাক কাটে—কলার থোর মোচা সংগ্রহ করে আনে। সিদ্ধ করে ছেলে মেয়েদের খেতে দেয়। কিন্তু ক'বেলা এসব দিয়ে চলে? মুখে দিলেই আর পেটে সহ্য হয় না। প্রথমই শরীর খারাপ হয় সখিনার তারপর অসুস্থ হয় অবোধ ছেলে দুটো। মেয়েটা বছর এগারর—সে তো ও সব কিছু মুখেই তোলে না। সখিনার শরীর কাবু—মুখ শুকিয়ে আসে, দেখতে দেখতে বুক শুকায়। কিন্তু এ সব কোলের ছেলেটা বোঝে না—ক্রমশ তার দৌরাত্ম বাড়ে। মার মুখে চোখে খামছি মারে, চুল ছেঁড়ে, মাইর বোঁটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চায়। দুনিয়া দগ্ধ হয়ে যাক তবু তার দুধ চাই।

মায়ের মুখ চোখের একটু আভা বড় মেয়েটা পেয়েছিল। কোটরাগত চোখ জোরা দেখলে মানুষের মনে একটা দয়ার উদ্রেক হয়। কাপড়-চোপড় শত ছিন্ন হলেও তার কাছে এসে একটু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয় 'তোমার কি দরকার? অত শুকনা দেখাচ্ছে কেন মুখ?'

বাড়ির ওপরের সরিকদের অবস্থাও সমান-সমান। তারা পারলে গতর দিয়েই কিছু সাহায্য করতে পারে—পয়সা কিংবা চাল দিয়ে নয়। তাই তারা বেশি এগোয় না। আর এ সব অভাব অভিযোগ তাদের গা সওয়া হয়ে গেছে। সেবার আব্বাসের চাচাত ভাই মারা যাওয়ায় তাদের সংসারেরও তো অমনি হাল হয়েছিল। তখন আব্বাসইবা কি সাহায্য করতে পেরেছিল!

দিনান্তে যে যা দু এক সের সংগ্রহ করে আনতে পারে, সে তা জ্বাল দিয়ে খায়। কারুর মুখের দিকে কেউ চায় না। ওরাও প্রত্যাশা করে না।

এমনি সময় ওপাড়ার দরবেশ আসে খোঁজ নিতে। বুড়োর যেমন নামটি তেমনি শ্রীটি! পাকা দাড়ি, মুছুল্লির মত ঢিলা আলখাল্লা পরা। গা বেয়ে যেন স্বাস্থ্য ঝরে পড়ছে। যেমন তার অবস্থা তেমনি তার মহব্বৎ।

বাড়ির সকলে এগিয়ে এসে তাকে উঠানে একটা মোড়া পেতে বসতে দেয়। সে 'না, না', করে একখানা সামান্য চাটাই টেনে সখিনার দাওয়াতেই বসে পড়ে। কান পেতে থাকে সখিনা কথা শুনবে বলে। বড় মেয়েটা দাওয়ায় বসে ছিল, বুড়োকে দেখে লজ্জায় না কি ভেবে যেন উঠে ঘরে গিয়ে মায়ের আবডালে লুকাল।

বুড়ো দরবেশ মন্তব্য করে, 'বড় লাজুক, না?'

উপস্থিত সকলে একটু আপ্যায়িতের হাসি হাসে। এবং এমন ভাবপ্রকাশ করে যে দরবেশ যেন অসন্তুষ্ট না হয় বালিকার ব্যবহারে।

সখিনাও ছোট্ট কুঁড়ে ঘরখানার একপাশে ঝাঁপের আবডালে জড়ো সড়ো হয়ে বসেছিল। সে ডিবাটা খুঁডে খুঁড়ে একটু তামাক বার করে এবং তাই সেজে মেয়েটাকে বলে, 'মামুজীকে দিয়ে আয়।'

মেয়েটা কেমন কেমন করে, এগারতে পা দিয়েই সে যেন সোমত্ত হয়ে উঠেছে।

'আ মর—তোরই যত সরম !'

লজ্জার কারণ সখিনারই বেশি। এখনও রূপটা তার টিমিয়ে টিমিয়ে জ্বলছে। বয়সও পার হয়নি পঁচিশের কোঠা।

আবার চাপা গলায় সখিনা আদেশ করে মেয়েকে। 'যা, মামু তোর বইসা আছে। হুঁকা নিয়া যা।'

এবার দরবেশ বলে, 'অ্যাঁ আমি ওর মামু নাকি? কও কি?'

অত্যন্ত জড়ো-সড়ো অবস্থায় কোন প্রকারে হুঁকোটা এগিয়ে দিয়ে মেহেদি সরে পড়ে।

দরবেশ বসে বসে তামাক টানে। তামাক পোড়ে, গুল ছাই হয়ে যায়—এখন কল্কি হয়ত ফাটবে! দরবেশের হাত থেকে হুঁকোটা একজনে চেয়ে নেয়। 'চিন্তায় পড়ছে মেয়া ছাহেব। দায়িত্ব তো কম না।'

দরবেশ আর কিছু বলে না, উঠে চলে যায়। কিছুক্ষণ বাদেই কয়েক সের চাল আসে। বেশি না, সের তিনেক।

সখিনা আবার তিন দিন সময় পায়। এক এক সের চাল জ্বাল দিয়ে দিন কাটায়। আর মাথা মুণ্ডু ছাই-ভস্ম সব চিন্তা করে। এ খাওয়া খাওয়া নয়। এর জের আছে। আবার ভাবে, কেন? বড় লোকে তো কত খয়রাত দেয় গরিবকে। এ তো খয়রাত ও হতে পারে। তবে মিছামিছি সে কেন চিন্তা করে মরে? চিন্তা সে কিছুতেই করত না, যদি তার একটু রূপ না থাকত!

চাল ফুরায়। একটানা উপোষ যায়। সখিনা দাঁতে দাঁত দিয়ে থাকে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। আবার

সখিনার চোখ ভিতরে বসে যায়। গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে আসে। মরতে ইচ্ছা হয় গলায় দড়ি দিয়ে। আব্বাস হাজতে আছে, তারও কোনো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না যে সে একটু বুকে বল পাবে। তিন কুলেও সখিনার কেউ নেই। চোখে অন্ধকার দেখে। ভবিষ্যতের কথা দূরে থাক, আজ সে কি করবে?

এমনি সময় আবার চাল আসে।

সখিনা ছেলে মেয়েদের ফ্যানা-ভাত রেঁধে দেয় আর দোয়া করে দরবেশকে। ওর ধানের গোলা ধন্য হয়ে উঠুক এমনি পুণ্যে। খোদা ধন্য করো, ধন্য করো!

রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে একজন দূতী আসে। সখিনা প্রায় চিৎকার করে ওঠে। রাত তো কম হয়নি।

'চুপ চুপ আমি নসাইর মা।' গ্রাম্য এক ধাত্রী।

সে অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে সখিনাকে বুঝায়। দোষ কি? অবস্থা তো খুবই ভাল, বয়স না হয় একটু বেশি। এখনই তুলে নিয়ে যাবে। মুছুল্লি মানুষ ফল না পাকলে সে কিছুতেই ফুল ছিড়বে না। রাজী হয়ে যাক সখিনা যদি এ যাত্রা বাঁচতে চায়। কবে জেল থেকে আব্বাস আসবে তার কি কোন ঠিক আছে। কোন-না তার এতদিনে কালাপানি হয়েছে। সাহেব-সুবোর বিচার বড় কঠিন বিচার। ওদের কি দিল্-আছে? নসাইর মা একটু থামে, নিশ্বাস নেয়।

'তুমি যা কইছ তা তো ঠিক, কিন্তু—'

'আর কিন্তু-কিন্তু করিস না। পেটে ক্ষিধা মুখে লাজ—এ ভাল না রাজী হইয়া যা।'

'কিসে?'

'ওই যা কইলাম।'

'তুমি পাগল, মাইয়া বিয়া দিমু এখন?'

'না দিলে তো না খাইয়া মরবি। আর বিয়া দিলে সুখে থাকবি, আখেরেটাও গুছাইয়া রাখলি। বুড়া মরলে ও একটা বড় সম্পত্তির মালিক হইবে। ফের নিকা বসলে রাখবে কে?' নসাইর মা একটু বিরাম দেয়।

বাইরে শেয়ালেরা দ্বিতীয় প্রহর ঘোষণা করে। 'কি সখিনা?'

'কিছু না—তুমি বাড়ি যাও। কইও, মেয়াছাহেব বুঝি জুত পাইছে?'

'এত দেমাক—আচ্ছা!' নসাইর মা ওঠে। কয়েকটা টাকা এনেছিল তা অন্ধকারে একটু ঝন-ঝনিয়ে আঁচলে বাঁধে। 'ভাল করলি না সখিনা।'

'এ্যাঁ টাকা! কয় টাকা? পইড়া গেল নাকি?'

'না। বলিস তো দিয়া যাই বায়না।'

'আমার ঘর থিকা বাইর হও জলদি।'

'ওঃ খেঁকি কুত্তার দেখি রাগ আছে।'

আবার চাল বন্ধ হয়। ঢেঁকির শাক, কচুর শাক, থোর মোচা চলতে থাকে। এমন পোড়া ভিটা যে এক কুড়ি গাছে একটা ডাবও নেই। হয় খুবই, কিন্তু থাকে না। সরিকী গাছপালার এই মজা।

সখিনা দিন গনে কিন্তু আব্বাস আসে না।

সে মেয়েটাকে নিয়ে এবাড়ি ওবাড়ি ধান ভেনে দিতে যায়। কিন্তু খালি পেটে রোগা শরীরে কতক্ষণ পার দিতে পারে! এক একটা ঢেঁকির ওজন তো কম নয়।

তবু সখিনা সপ্তাহখানেক জোর জবরদস্তি করে কাটায়। এক একদিন রাত্রে যখন ছেলে মেয়েগুলি ঘুমিয়ে পড়ে, সে উঠে পেট ভরে জল খায়। তারপর ভাবতে বসে। এত বড় ছুনিয়াটায় তার অর্থ নেই, একটু আশা নেই—না আছে পরামর্শ দেওয়ার একটি মানুষ। সব ফাঁকা। তবে আর ভরসা কি? কোন আশায় বুক বেঁধে সে লড়বে?…সে নিজে ছেলেমেয়েগুলো নিয়ে নিকা বসবে। যদি এ প্রস্তাব সে করে নিশ্চয় দরবেশ রাজী হবে। একটুখানি কচি মেয়ে মেহেদি, এখন পর্যন্ত কিছুই বোঝে না। ওকে দিয়ে দরবেশের কি আশা পূর্ণ হবে? তার চেয়ে সখিনা কি সহস্রগুণে অভিষ্ঠা নয়? সে বুড়োর সব রকম তোয়াজ করতে পারবে। দরদ দিয়েই তা সে করবে—করবে সে ছেলে মেয়ের মুখ চেয়ে। তবু সে এখন মেয়েকে বিয়ে দেবে না। ওই তো কচি মেয়ে।

সখিনা পরদিন লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে নসাইর মার মারফতে প্রস্তাব পাঠায়।

নসাইর মা আনন্দের সংগে সংবাদ নিয়ে দরবেশের বাড়ির দিকে যায়। কিন্তু কাজ হয় না। দরবেশ হাসি মুখে প্রত্যাখান করে। সে বলে যে সখিনার বিয়ে আইনত অশুদ্ধ—কারণ আব্বাস তো তাকে ত্যাগ করেনি—অর্থাৎ তালাক দেয়নি।

এরপর সখিনা ভিক্ষায় বার হয়।…

কিন্তু ভিক্ষায় জাতই যায়, পেট ভরে না। দু একদিন মানুষে আগ্রহ দেখায়, তারপর মুখ ফিরিয়ে থাকে। ক্রমে পাওনা কমে এবং তার পরিবর্তে বাড়ে গ্লানি। একদিন সত্য সত্যই খালি হাতে ফিরে আসে সখিনা। রাত্রে ছেলে মেয়েগুলো কান্না কাটি চেঁচামেচি করে ঘুমিয়ে পড়ে। সে আর সইতে পারে না। সে ঠিক করে

আগামী কালই দরবেশকে কথা দেবে। কিন্তু তার শরীরের যেমন অবস্থা তাতে আগামী কাল পর্যন্ত তার মাথায় ঠিক থাকে কিনা সন্দেহ। সে তাকিতুকি ক'রে নানা ভাণ্ড খুঁজে কতকগুলো সীমের শুকনা বীজ বার করে। সে সেইগুলো খুঁটে অন্ধকারে বসেই চিবায়। আস্তে আস্তে মুখ নাড়ে—পাছে ওরা সজাগ হয়ে পড়ে। ঘুম ভাঙলেই তো তার ভাগ্যে নিত্যকার মত বিড়ম্বনা। কিসের ছেলে কিসের মেয়ে? নিজে বাঁচলে সব। সে বীজগুলো নিঃশেষ ক'রে জল খায়।

সকাল বেলা সখিনা স্বীকার করামাত্র ঝটপট সব কাজ সারা হয়ে যায়। চাল আসে, ভাল-মন্দ সাজানি কাপড় আসে—তেল আলতা কোনটা বাদ যায় না।

খুব ধুমধামে সাদি হয়ে যায়। গাঁয়ের লোক ভাবে: বাঁচল সখিনা—দরবেশের দয়ায় বাঁচল।

আব্বাসের সংবাদ পেয়ে মন্মথ বাড়ি আসে। এমনিও সে বাড়ি ফিরত। কাজে সুবিধা নেই। মহাজন খরিদ বন্ধ করেছে। মন্মথর দেখতে না দেখতে বরাত ভেঙে পড়ল।

সে বাড়ি এসেই থানায় যায়। সৌদামিনী এতদিনে সবই বুঝেছে এবং আব্বাসের যে কোন দোষ নেই তা খুলে বলেছে মন্মথকে।

'চার্জ সিট চলে গেছে—আমাদের সংগে ছেলেখেলা পেয়েছে! আজ একটা, কাল আর একটা। সত্যি হক মিথ্যা হক সাক্ষী দিতে হবে—মালও যা খানাতল্লাসে পাওয়া গেছে তা সনাক্ত করতে হবে। বলতে হবে তোমার জিনিষ।'

'বাবু, যে মালের কথা বলছেন তার একটাও তো আমার না।'

'যে শালার ঘরে একটা ফুটো মেটে বাসনও নেই, সে কাঁসার বাটি পেল কোথায়?'

'আমি ওর ছেলেকে দিয়েছিলাম দুধ খেতে—ছোট ছেলেটাকে গত বছর।'

'ভাগ্‌ শালা, চোরের সংগে দোস্তি।' জমাদার সাহেব বলেন, 'বাঁধ শালাকে তেওয়ারী।'

তেওয়ারী গোঁফে চাড়া দেয়।

মন্মথ থানা থেকে বেরিয়ে এসে সদরে যায়, অবশ্য সরকারী খরচে নয়—নিজের খরচে।

সে বাদী পক্ষ হয়েও আসামীর জন্য তদ্বির করতে থাকে এবং প্রথম দিনই সে আব্বাসকে খালাস করে নিয়ে বাড়ি ফেরে। মন্মথ বলে, 'মিতা বোঝই তো সব, আমি আর বলব কি—এই তো গ্রামের অবস্থা।'

'আমার আর কিছু বাকি নাই বোঝতে—মিতাইনের কি দোষ! তারপর আমার বাড়ির ওরা কেমন আছে?'

'আমি ঠিক জানি নে—চলো স্বচক্ষেই দেখবে সব। তবে মনে হয় ভাল আছে সকলে।' মন্মথ খানিক আমতা আমতা করে।

'তা থাকলেই ভাল।'

'দুজনেই হেঁটে রওয়ানা হয। সারা রাত হেঁটে ওরা বেলা প্রহর খানেকের মধ্যে বাড়ি পৌছায়।

'মেহেদির মা, ও মেহেদির মা!'

ঘর থেকে সখিনা ছুটে বার হওয়ার কথা, কিন্তু ঘরে যে জনপ্রাণী আছে তাই বোঝা যায় না। সে বসে বসে কাঁদছে।

মেহেদির অবস্থা নাকি সংগিন।

ডাক্তার বৈদ্য এসেছে, সংজ্ঞা ফিরছে না মেহেদির। নসাইর মার মারফত দরবেশ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা নাকি সে প্রতিপালন করেনি।

সমস্ত শুনে আব্বাস ছুটে গেল মন্মথর কাছে। 'এখন মিতা কি করি কও তো? লোকে তো কইবে মুখ্য গোঁয়ার। আমার মাথার ভিতর চিলিক মারছে যেন সাপের বিষে।'

মন্মথ ঘর থেকে একখানা ধারাল হাসুয়া বার করে আব্বাসের হাতে দেয় এবং তাকে অনুসরণ করে।

দরবেশদের বাড়ি বেশি দূর নয়—রশি কয়েক। পাঁচ সাতজন কৃষাণ খাটছে।

দরবেশ ওদের দূর থেকে দেখেই তিন-তালাক দিয়ে ঘরে ওঠে। অর্থাৎ উপস্থিত সকলের সুমুখেই আব্বাসের মেয়েকে বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়।

আব্বাস ও মন্মথ মেহেদিকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বাড়ি নিয়ে আসে। বহু যত্নে তার জ্ঞান ফেরে।

তামাক টানতে টানতে ওরা মন্তব্য করে, 'বুড়া শালা কুত্তা!'

চার

এরপর কয়েকটা বছর মন্মথ নিজের ওপর যেন ভীষণ নির্মম হয়ে ওঠে। সংসার প্রতিপালন করে, যৌবনটাকে ঘাত প্রতিঘাতে জীর্ণ করে বহু কায়ক্লেশে কয়েকটা টাকা জমায়। দিন রাত শরীরটাকে জিরান দেয় না। হেন কাজ নেই যা সে করে না। তাই সাতাশ আটাশ বছরেই তার চোখের নিচে পড়ে কালো দাগ। চুলও পাকে দু চারটা।

এত খেটেও মন্মথ আর কটা টাকাই বা জমাতে পারে! জমিয়েছে সামান্যই। সেই টাকা কটা বিনা খতে দলিলে দায়গ্রস্ত হিন্দু-মুসলমানের হাতে ঘোরে। মেয়ের বিয়ে কিংবা বাপ মার শ্রাদ্ধে, নয়ত ছোট-খাট কারবারীর জমায় টান পড়লে ধার নেয়। আবার সময় মত কিছু সুদ দিয়ে শোধ করে দেয় হাসি মুখে। 'ভাই মন্মথ বড্ড উপকার করলে।'

মন্মথ লজ্জিত হয়ে জবাব দেয়, 'কি যে বল তোমরা!'

ক্রমে আর একটু ভারি হয় মন্মথর জমা।

কিন্তু হঠাৎ আসে প্রজাস্বত্ব আইন। বসে ঋণ-সালিসী-বোর্ড।

বোর্ডের চেয়ারম্যান স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডেরও প্রেসিডেন্ট। সালিসী-বোর্ডকে শক্ত করার জন্য মকর্দমা খোঁজে। নিদেন পক্ষে সত্তর আশিটা মামলা না হলে বোর্ড চলবে কিসের জোরে? রেলের ইঞ্জিন হলে কয়লা চাই, মোটর হলে পেট্রোল চাই—ঋণ-সালিসী-বোর্ডেরও তো একটা খরচা আছে! অবশ্য বে-সালিসী।

মন্মথর দুটি খাতক তার প্রাণপাত করা সঞ্চয় নিয়ে সালিসী-বোর্ডে ঢোকে। মন্মথর দিকে চেয়ারম্যান বাঁকা চোখে তাকায়।

'এমন রক্ত-চোষা কারবার কতদিন হয় শিখেছ?'

'হুজুর মা বাপ, আপনি তো সবই জানেন, আমার গায়ের রক্ত-জল-করা পয়সা। এ তো লগ্নী-লহনা কট-কবালার টাকা নয়। নিতান্তই ধার নিয়েছে প্রমদা ও ইদ্রিস।'

'জানব না কেন, সবই জানি—বর্ণনা দাও।'

'বিনা দলিলে ধার দিয়েছি—এ কোনো সুদের কিম্বা চুক্তির মহাজনী কারবার নয়—একেবারেই ঘরোয়া ব্যাপার। এরজন্য তো বর্ণনার দরকার হয় না।'

'হবে না কেন? তোমার মতলব ছিল সুদ খাওয়ারলা নইলে বিনা কারণে কেউ আর মামলা করে না। বর্ণনা দাও, প্রমাণ কর নিজে নির্দোষ। আপনা থেকে ডিসমিস হয়ে যাবে মিথ্যা মকর্দমা। আদালতে কান্না-কাটি মামা বাড়ির আবদার চলে না।'

'হুজুর!'

'আমাকে বিরক্ত কর না।'

মন্মথ তেমন লেখাপড়া জানে না, জাল-জুয়াচুরিও শেখেনি—শেখেনি কাগজপত্রের মার-প্যাঁচ—তাই মহা ফাঁপড়ে পড়ে। এই তো তার জীবনের সমস্ত সঞ্চয়। হাঁপড় যেমন হাঁপায় তেমনি হাঁপাতে হাঁপাতে সে বছর দুই ছুটোছুটি করে ঋণ-সালিসী-বোর্ডে। কিন্তু কিছু ফল হয় না।

অনেকটা ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণপর্বের মত হয়ে থাকে তার মামলাটা। সে মনের দুঃখে একদিন স্থির করে, না—সে এদেশ ছেড়ে যাবে।

কিন্তু কোথায় যাবে ?

অনেক সলা-পরামর্শের পর স্থির হয় কলকাতা।

বড় সহর, জুটবেই একটা কিছু। আর পারে না সে দিন রাত লগি বৈঠা ঠেলতে। হাড়ের জোড়া তার ঢিলা হয়ে গেছে। সারা দিন খাটবে, রাতটা তো বিশ্রাম পাবে।

এই মন্মথর দেশ ত্যাগের অকিঞ্চিৎ ইতিহাস।...

নৌকায় ওঠার সময় সে একবার চেয়ে দেখল : হোক সাত সরিকের, তবু কত বড় বাড়ি, কেমন সব গাছ-গাছালি, কত বড় পুকুর, দক্ষিণে কেমন খোলা মাঠ! এ সব ছেড়ে যেতে কার না মায়া হয়? লাভ না থাক মায়ার টান যে বিষম টান।

একটা গরিব একরকম সব খুইয়ে দেশ ছাড়া হচ্ছে, বিদায় দিতে খাল পারে তেমন কেউ আসে নি। বাড়ির ওপরের সরিকেরা ঘরে বসেই হাতের কাজ বজায় রেখে আপশোষ করেছে। শুধু এসেছে আব্বাস কয়েকটা জালি শশা ও গোটা দুই ডাব নিয়ে। সে মুখ ফুটে একটা কথাও বলতে পারে না, কেবল ঐ যৎকিঞ্চিৎ সামগ্রীগুলি মিতার হাতে তুলে দেয়।

নৌকা ছাড়ে বদর বদর করে।...

পাঁচ

কলকাতায় পৌঁছে সমস্যায় পড়ল মন্মথ। কিন্তু কোথায় যাবে? সামান্য চেনার চেনা তো কতই রয়েছে। বিশেষ ভরসা করে যে ভাইয়ের বাসায় উঠবে ভেবেছিল সে নাকি লোক পাঠিয়ে সংবাদ জানিয়েছে—তার বাসায় স্থানাভাব। তবে স্থানাভাব হলেও মন্মথর জন্য সে যে কোনও ভাবে স্থান সংকুলন করে দিতে পারে যদি সে একা গিয়ে ওঠে তার বাসায়। প্রস্তাবটা মন্দ নয়। বাকী সব থাকবে কোথায়?

মন্মথ শুকনা মুখে ঘুরছে—হঠাৎ দেশী লোক নবীন মণ্ডলের সংগে দেখা।

সব শুনে সে বলে, 'চলো, চলো—চিন্তা নেই মন্মথ। যার কেউ নেই তার ঈশ্বর আছেন।'

সে দিন মন্মথ নবীনের বাসায়ই থাকে। সবাই মিলে কুকুর-কুণ্ডলী দিয়ে একটা খোলার ঘরে কাটায়। পরদিন নবীন তাকে নিয়ে কারখানায় যায়। খালের ওপারে বিরাট কারখানা—দিন রাত কাঠ কাটা হচ্ছে। বড় বড় করাতগুলো বৈদ্যুতিক শক্তিতে দিন রাত ঘুরছে। মন্মথ অবাক হয়ে যায়। 'এসো এসো এখন আর হাঁ করে থেকো না। প্রথমেই অত বড় হাঁ করলে, দু মাস বাদে যে চোয়াল চিরে যাবে। দেখছ না আমাদের অবস্থা। এখন আর মুখ বুঁজতে পারিনে দিন রাতই হাঁপাই।'

সত্যই নবীনের বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হচ্ছে—মুখ খুলে শ্বাস নিচ্ছে। সে বলে, 'দেশ ছেড়ে কেন এসেছ মরতে? দেশে কেমন হাওয়া, কেমন জল। যাক, চলো ছোট সাহেবের কাছে।'

ময়লার গাদা, করাতের গুঁড়ো, কাঠের ফালি ঠেলে যেখানে গিয়ে মন্মথ ও নবীন দাঁড়ায় সে তো ইন্দ্রপুরী। ঝকঝকে তকতকে সব সেগুন কাঠের ফার্ণিচার। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। একটু শব্দ আসতে পারে না এ ঘরে। মন্মথর সাহসই হচ্ছিল না ধুলো পায় এখানে ঢুকবে।

ছোট সাহেব বড় দয়ালু। নবীন মণ্ডলকে দেখেই হেসে বলেন, 'বুঝেছি। এখন তো আর লোকের দরকার নেই। তবু এনেছ, নিয়ে যাও তোমার ডিপার্টমেণ্টে। নাম?'

'মন্মথ দে।'

'লিখে নাও মল্লিকা।'

'লেখা হয়ে গেছে। ঠিকানা?'

প্রশ্ন বোধক দৃষ্টি মেলে এক জোড়া চোখ মন্মথর দিকে তাকায়।

এ কি ইন্দ্রানী—তাই এখানে? মন্মথ ভাবে।

'এখন পর্যন্ত ঠিক হয়নি ঠিকানা।'

ছোট সাহেব ইংরাজীতে মন্তব্য করলেন, 'এ ভ্যাগাবণ্ড।' তারপর হেসে বললেন, 'নিয়ে যাও নবীন। তোমার ডিপার্টমেণ্টটি তো ধর্মশালা।'

নবীন খুশি মনে বিদায় হয়।

মল্লিকা বলে, 'এ লোফার। আমার দিকে যে ভাবে তাকিয়েছিল!'

'তুমি তো আমাকেও রেহাই দিলে না।'

'ছিঃ ছিঃ কেন বলুন তো ?'

'আমরাও তো তাকাই। দেখার জিনিষ হলে কে না দেখে বলো তো ?'

'ছিঃ! ছিঃ! আপনি কার সংগে কার তুলনা করছেন!' মল্লিকার মুখখানা রাঙা হয়ে ওঠে।

'তুমিও দেখি ঠাট্টাটা বুঝলে না।'

মল্লিকা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখে। ছোট সাহেব এগিয়ে গিয়ে তার মুখখানা তুলে ধরেন। মল্লিকার চোখে জল।

মল্লিকা চোখ মোছে।

'এত সেন্টিমেন্ট নিয়ে কি চাকরী করা চলে!'

'আমি তো চাকরী করি না—গান শোনাই।'

'কাকে ?'

'যে ভালবাসে তাকে।'

'তুমি কবি মল্লিকা।' ছোট সাহেব একটু হাসেন।

অফিস-ছুটির পর ছোট সাহেব মোটর হাঁকিয়ে মল্লিকাকে একটা সাধারণ ভদ্র পল্লীতে এগিয়ে দিয়ে যান। কালিঘাটে, ছোট্ট একটা একতলা বাড়িতে মল্লিকা ও তার বিধবা মা গুটি দুয়েক ছেলে নিয়ে থাকে। ছোট সাহেব বড় অমায়িক ব্যক্তি। এখানে বসেই তিনি চা খান—মল্লিকার অনুরোধে দুখানা লুচিও না খেয়ে পারেন না।

এমনি ভাবেই দিন কাটে।

একদিন অতর্কিতে ছোট সাহেব এসে হাজির হন।

ঘরে মল্লিকাও নেই তার মাও যেন কোথায় গেছে।

যীশু ও বিশু একটা রবারের বল নিয়ে খেলছে।

'তোমরা ইস্কুলে যাও নি ?'

বিশু জবাব দেয়, 'না। দুমাসের মাইনে—'

যীশু চট করে এসে বিশুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে, 'তা নয়, তা নয়। দিদি বলেছে আমরা প্রাইভেটে পরীক্ষা দেব—তাই ইস্কুলে যাইনে।'

'দাদা, ফের মিথ্যে কথা বললি। দিদি না তোকে মিথ্যে বলতে নিষেধ করেছে।'

'আমরা মাইনে চালাতে পারব না—সে কথা কি সবাইকে বলতে হবে।'

'থাক তোমাদের আর কিছু বলতে হবে না—কাল থেকে ইস্কুলে যেও মাইনে লাগবে না।'

'কেন লাগবে না ?' যীশু জিজ্ঞাসা করে।

'তোমার দিদির মাইনে বেড়েছে। সে তোমাদের সব বাকি মাইনে চুকিয়ে দিয়ে এসেছে আমার সামনে।'

'দিদি দিদি—সত্যি নাকি দিদি ?' দু ভাই দিদির খোঁজে ছোটে এক সংগে।

সন্ধ্যার সময় ছোট সাহেব ভবানীপুরের অমনি একটি পল্লীতে প্রবেশ করেন।

'এসেছেন—এত দেরী হলো যে ?'

'দিনের আলোতে সন্ধ্যার খোঁজে আসা নিষ্ফল নয় কি ?'

'আপনার কেবল ঠাট্টা। ভিতরে আসুন।···চা খাবেন ?'

'নিশ্চয়।'

'মিনু, মিনু—দাঁড়ান এক্ষুনি আসছি।'

'কি দিদি ?'

'দু' পয়সার চা, দু পয়সার দুধ আর দু পয়সার চিনি নিয়ে আয়।'

'এনে দিচ্ছি, মিনু বলে। 'কিন্তু আজ আমাকে সেই ফ্রকটা কিনে দিতে হবে।'

'দেব যা শীগগির।'

'তোমার মা কেমন আছেন?'

'একটু ভাল। আজ নিজে উঠেই ঠাকুর ঘরে যেতে পেরেছেন।'

'উনি রাত্রে নাকি কিছু খান না—এই ফল কটা এনেছি।'

'এতগুলো আংগুর বেদানা আপেল! মিছামিছিই আপনি এত খরচ করছেন!'

'তোমাকে আর ডেঁপোমি করতে হবে না। তুমি পার তো চটপট একটু চা খাওয়াও, তারপর চলো। আজ কোথায় যাবে? টালিগঞ্জ রেস কোর্সের ধারে? বেশ নির্জন—না?'

'যেথানে আপনার খুশি।'

'তোমার ও তো মতামত আছে।'

'আমি তো আজ পর্যন্ত কোনও মতামত প্রকাশ করিনি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।'

'তা করো নি বটে। তবু—'

সন্ধ্যা চা নিয়ে আসে। দুজনে চা খেয়ে বেরিয়ে যায়।

ছোট সাহেব ধীরে ধীরে চা খান। চেয়ে দেখেন সন্ধ্যার সাপটে পরা শাড়িখানার দিকে। 'বাঃ বেশ তো মানিয়েছে!'

'দিয়েছে কে যে মানাবে না? বলুন তো কার ছোঁয়া লেগেছে প্রথম?'

তুমি নিশ্চয় লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লেখো—অদ্ভুত তোমার ব্যঞ্জনা!'

আপনি এত ক্ল্যাটারীও জানেন! সত্যি মুগ্ধ হয়ে যেতে হয় শুনলে। তখন আর বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না।'

ছোট সাহেব হাসেন সন্ধ্যার পানে অপাংগে চেয়ে।

সন্ধ্যা যেন শিউরে ওঠে।

ঘণ্টা তিনেক বাদে দুজনে আবার ফিরে আসে। ছোট সাহেব গাড়ি থেকেই বিদায় নেয়। সন্ধ্যা শ্রান্তদেহে ক্লান্ত চরণে বাড়ি ঢোকে।

'দিদি আমার ফ্রগ।'

'এই নে।'

'মা, আজ কি আমার ওষুধটা আনতে পেরেছিস?'

'এই নাও।'

'কত দাম হলো?'

'চার টাকা।'

'বলিস কি?'

হঠাৎ সুমুখের আয়নায় নিজের মুখখানা ও চোখের কোলের কালি দেখে বড় বিষণ্ণ হয়ে পড়ে সন্ধ্যা।

তখন হয়ত ছোট সাহেবের গাড়ি আর একটা নিম্নবিত্ত পল্লীর দিকে ছুটে চলেছে।

ছয়

মন্মথর চাকুরী হলো। নবীন সেদিনই একখানা বাসাও জুটিয়ে ফেলল তার জন্য। একটা সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা ও সাড়ে চার হাত পাশে একখানা ঘর—সামনে একটা বারান্দা, মাসিক ভাড়া মাত্র আড়াই টাকা। ঐ বারান্দাটাই রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, সময়তে বৈঠকখানা। ঘর যতটুকুই হোক ওর মধ্যে এই সামান্য পরিবার পুষিয়ে নিতে হবে, নইলে চলবে কি করে এ মাইনায়।

ঘর দেখে প্রথমে কান্না পায় মন্মথর। দেশে ওদের ভাতের অভাব, কিন্তু জাতটা বজায় ছিল। এমন বেপরদা বেআব্রু রান্নার জায়গায় কলতলা পাইখানা সে কল্পনাই করতে পারেনি। যেমন শ্বশুর বাড়ি তেমনি দেশেও তাদের কিছু মান মর্যাদা আছে, এখনও দোল-দুর্গোৎসবের অংশীদার তারা। ফলন্ত গাছগাছালি সমেত কেমন বাড়িখানা—পুরান হলেও কত বড় টিনের ঘর। তবে বরাতের ফেরে কলকাতায় আসা। সে কেমন করে সোমত্ত মেয়ে ও স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এর মধ্যে কাটাবে!

নানা লোকের মুখে সহরের সে গল্প শুনেছে, বাড়ি ঘর দোকান পসার দালান কোঠার—আর একা একা স্বপ্নও দেখেছে।

সুখের স্বপ্ন…

সুখ আছে। স্বপ্ন তার মিথ্যা নয়, রাস্তার ও পাশেই তো কত বড় বড় বাড়ি। কত জায়গা পড়ে রয়েছে এদিক ওদিক। কুকুরটার জন্যই তো কেমন একটা কোঠা আছে ঠিক মন্মথদের ঘরের মুখোমুখি—কত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

হঠাৎ মনে পড়ে মন্মথর ছোট সাহেবের আফিস ঘরখানাও তো ইন্দ্রপুরী! সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে।

এক একদিন বড় মেয়েটা কলতলা থেকে স্নান করে আসার পথে একেবারে অতিষ্ট হয়ে যায়। এমনিতেই ছেঁড়া কাপড় সামলান দায় তার ওপর মানুষের চোখের চাহনিগুলো যেন মৌমাছির হুলের মত থোকা বেঁধে তার দেহেব ওপর এসে পড়ে। সে হাঁটু সামলাবে না উরু সামলাবে না বুক সামলাবে কিছুই দিশা করতে পারে না। ভিজা পচা কাপড়, সামান্য টানেই ছিঁড়ে এক একটা যেন জানালা সৃষ্টি করে। মন্মথ নিজে লজ্জায় সরে যায়, কিন্তু অন্য ভাড়াটেরা সরে না। তাদের নিষেধও করতে পারে না। আর এর তো কোন ধরা বাঁধা আইন নেই।

মন্মথকে এ সব সমস্যা এবং অসামঞ্জস্য এক এক সময় ভীষণ আঘাত করে। একটা ইচ্ছা জন্মে প্রতিবাদ করতে। কিন্তু কেমন করে তা করতে হয় তা সে জানে না, কিম্বা কাউকে কোনদিন উদ্ধত জবাব দিতেও দেখেনি। আর তার অবকাশই বা কই? সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই সাজ-শব্দ রব—ছুটতে হয় সকাল সাতটায়। খালাস পেয়ে যখন সে ফেরে তখন প্রায় সন্ধ্যা। সারা দেহের ধুলো ময়লা ছাড়াতেই রাত হয়ে যায়। তখন পাকস্থলীটায় হু হু করে চিতা জ্বলতে থাকে। তাতে আহুতি দিয়েই সে নির্জীব হয়ে পড়ে। কে কি করল, কে কি খেলো তাও জিজ্ঞাসা করতে তার উৎসাহ থাকে

না। রাতটা কাটে ক্লোরোফর্ম টানা রোগীর মত। রবিবারও তার কামাই নেই—কামাই দিলে মাসের টাকা কমে যাবে। সে-ধাক্কা সে কুলাবে কি দিয়ে?

এপারের বস্তিতে মন্মথর যখন এই অবস্থা, তখন ওপারের বাড়ি-গুলোতে অফুরন্ত অবকাশ। কাটে হাস্য বিলাসে, কাটে রেডিও চালিয়ে, সৌন্দর্যচর্চায়, থিয়েটার সিনেমায়।

সজ্ঞান রোগীর জ্ঞান হারাবার মুখে যেটুকু চৈতন্য থাকে, যেটুকু জড়িত সংজ্ঞা থাকে, তাই দিয়ে নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে মন্মথ: তার মেয়ে শোভার অমন চেহারা অথচ একখানা ভাল শাড়ি নেই কেন পরনে—কিন্তু ও-সব বাড়িতে নিত্য নতুন শাড়ি আসে কোথা থেকে?

ওপারের বাবুরা বলতে গেলে তো খাটেই না—শুধু খায় আর ফোলে। ওরা যখন খোস মেজাজে গাড়ি চালায় তখন এরা হেঁটে মরে—এ সব হয় কেন?

মানুষ তো সকলেই!

দু'একদিন স্বামী স্ত্রীতে কথা হয়। স্ত্রী বলে, 'অদৃষ্ট।'

মন্মথ সংগে সংগেই অনুমোদন করে, 'ঠিক বলেছ শোভার মা, ঠিক।'

কথাটা কানে যায় পাশের ভাড়াটে যতীনের। পায়রার খোপ। এ খোপে টুঁ শব্দটি হলে ও খোপে তার প্রতিধ্বনি অনিবার্য।

'বুঝলে না হে, এসব অদৃষ্ট নয়, অদৃষ্টের কথা চিন্তা করে, কি বলে তোমার আমার মত মুর্খেরা—যাদের জায়গা নেই, জমি নেই, শিক্ষা দীক্ষা নেই তারাই।'

'তবে এসব কি?'

'কারসাজি।'

'কার?'

'ঐ বেটাদের।' বলে বেড়ার ফাঁক দিয়ে অংগুলী নির্দেশ করে যতীন।

'সে কি রকম? ঠিক বুঝলাম না ভাই।'

'তুমি নতুন মানুষ, ওসব বুঝবে না। সে অনেক কথা। মোদ্দা এসব চালাকি ওদেরই জেনো।'

'আরে যাও, যাও। চালাকি করে বড় লোক হওয়া গেলে সব চালাকের বাড়িই দালান কোঠা উঠত। ভাগ্য একটা আছেই, আছে—কর্ম ফলও আছে। তা তোমরা আজ কালের ছেলে ছোকরারা মানবে কেন? তাই তো এত অধঃপতন।'

উত্তরে যতীন একটা ব্যংগ হাস্য করে।

সৌদামিনী বলে, 'ওটা একটা পাঁড় মাতাল, ওর কথা কি! ও তো হাসবেই। ওরা নাস্তিক, কিচ্ছু মানে না। জানে কেবল মদ খেতে। তুমি বসে রইলে কেন? এসো, এসো শোবে। কাল সকালে উঠেই তো আবার ঘানি ঠেলতে যেতে হবে।'

'তুমি শোও।'

'আমার জন্য তোমার আর মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি আগে শুয়ে পড় তো।'

ছেলে দুটো ও সোমত্ত মেয়েটা এমন কুকুর কুণ্ডলী দিয়ে শুয়েছে যে সৌদামিনীর জন্য আর স্থান নেই। একে গ্রীষ্ম কাল তাতে আবার এ কদিন ধরে পড়েছে ভ্যাপসা গরম। মশারী নেই। লক্ষ লক্ষ মশা ভ্যানভ্যান করছে ঝাঁক বেঁধে। সে পাখা হাতে করে বসে থাকে। যতক্ষণ ঘুমে একেবারে না ঢুলে পড়ে ততক্ষণ, প্রায় প্রত্যহই

তার এমনি কাটে। নিতান্ত যখন দেহটা অবশ হয়ে আসে তখন এক জায়গায় ঢলে পড়ে।

মন্মথ যত ধীরেই বলুক মন্তব্যটা যতীনের কানে যায়। সে একটা বিড়ি নিঃশেষ করে আর একটা প্রায় আধখানা পুড়িয়ে এ খোপের ঝাঁপের কাছে এসে বসে।

'মাতাল হলেও আমার মাথার ঠিক আছে মন্মথ দা।'

সৌদামিনী জড়োসড়ো হয়ে বসে। একেবারে তার গা ঘেঁষে এসে বসেছে যতীন। সংকোচ নেই মোটে।

মন্মথ একটু কুন্ঠিত হয়। তবে কথাটা শুনে ফেলেছে যতীন!

'না, না, তোমাকে কিছু বলিনি ভাই—বলেছি আজকালকার—'

'ছেলে ছোকরাদের। তার মানেই আমরা—অর্থাৎ আমি। মদ খাই, বেশ্যাবাড়ি যাই, ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই—আরও কত কি! কিন্তু তুমিই বা কতটুকু মুনাফা করেছ সাধু থেকে। দুঃখ তো তোমারও ঘুচল না।'

'কি করে ঘুচবে ভাই, খাটিযে একজন খাইয়ে পাঁচটি। বরাতের ফের সামলান দায়।'

'রাখো তোমার আবার ঐ পচা অদৃষ্ট। দেশটা স্বাধীন হতো তা হলেই বুঝতে সব। বুঝতে ওসব কিছু নয়।'

'ঈশ্বর নেই যতীন?'

'না, না।'

'অদৃষ্ট?'

'তাও নেই।'

বড় আঘাত পায় মন্মথ। যতীন উঠে যায়। সারা রাত মন্মথ ঘুমাতে পারে না। নিজের জীবনটা আগা গোড়া

সমালোচনা করে দেখে। দেখে বোঝে, যতীন মাতাল হলেও তার কথাগুলা যেন সত্য। তবু বাড়ির শালগ্রামশিলা পূজা-পার্বণের কথা অবিশ্বাস করতে মন সরে না। সে মুহ্যমান হয়ে থাকে।

আবার একদিন যতীন ঠিক অমনি আধখানা বিড়ি টানতে টানতে বাঁশের ঝাঁপটা ঠেলে এসে বসে—ঠিক অতখানি রাত্রে।

'কংগ্রেস বলছে আমরা স্বাধীন হলে প্রত্যেকে নিজেকে নিজে চালাবার ক্ষমতা পাব। এই ভারত জোড়া দুঃখী ভাই বোনদের অভাব ঘুচবে—ঘুচবে যত দুঃখ দৈন্য। তুমি কংগ্রেসের মেম্বার হবে মন্মথদা? মাত্র চার আনা চাঁদা—শুনে এলাম হাজরা পার্কের মিটিংয়ে।'

'নিশ্চয় হবো—পয়সা তো মোটে চার গণ্ডা।'

'শুধু পয়সা দিলে হবে না।'

'তবে?'

'খাটতে হবে।'

'খাটব।'

'যদি জান কবুল করতে হয়?'

'করব।'

তারপর মন্মথ একদিন নিকটস্থ কংগ্রেস অফিসে গিয়ে সভ্য হয়। পয়সা দিয়ে রসিদখানা নিয়ে বাসায় ফিরে এমন যত্ন করে তুলে রাখে যেন নবলব্ধ দীক্ষা মন্ত্রটুকু তার ঐ কাগজে লেখা।

অসভ্য যতীনটাকে আর দেখা যায় না। সে একটা হিন্দুস্থানী মেয়েকে নিয়ে যেন কোন দেশে পালিয়েছে। খালি খোপটায় তার কয়েকটা মদের বোতল ও আধ পোড়া বিড়ি গড়াগড়ি যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে মন্মথ ঐ রসিদ খানা দেখে আর তার একটা জাগ্রত উত্তেজনায় মন অধীর হয়ে ওঠে। সমস্ত দুঃখ ও নৈরাশ্য হরণের যেন যাদু-স্পর্শ আছে ওর মধ্যে। এমনি সময় তার একএকবার মনে পড়ে আব্বাসকে। যদি তাকে পেত, একখানা রসিদ এনে দিত। মিতা তার না জানি কত মন মরা হয়ে দিন কাটাচ্ছে!

সাত

মন্মথ বড় প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছে ছোট সাহেবের। এতদিন ছোট সাহেব এমনি একটি সরল ও সৎলোকই খুঁজছিলেন। ছোট সাহেবের দয়ায় কিছু মাইনেও বেড়েছে মন্মথর।

'তুমি এই জিনিষগুলো নিয়ে যাও—দিযে এসো সেই বাড়িটায়। মনে আছে তো নম্বরটা?'

'আজ্ঞে—হ্যাঁ।'

'তারপর এই চিঠিটুকু দেবে তোমার মল্লিকাদিকে। কারুর কাছে কারুর কথা বলো না কিন্তু। তুমি যে সরল মানুষ।'

'না হুজুর তা বলব না।'

মন্মথ ট্রাম থেকে প্রথম নামে ভবানীপুর। হাতে তার একটা রেশন ব্যাগ। কদিন সে রাত্রে এসেছে—বাড়িটা চিনতে একটু কষ্ট হয়। তবু ধীরে ধীরে খুঁজে বার করে।

'কড়া নাড়ে কে?'

'দিদি, মন্মথ এসেছে।'

সন্ধ্যা এবং তার মা একপ্রকার ছুটে যায়।

'তোমার ছোট সাহেব?'

'আসেন নি।'

সমস্ত জিনিষগুলো খুলে ছড়িয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে সন্ধ্যা এসে একটা টুলে বসে পড়ে। 'চিঠি পত্র?'

'না, সে সব তো কিছু দেন নি।'

মিনু একটা কমলা খাবে ভেবেছিল, কিন্তু দিদির অবস্থা দেখে আর সাহস হলো না। জিনিষগুলো ছড়ানই রইল। মন্মথ ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ঘর ছেড়ে।

তারপর সে চলল কালিঘাট। মনটা তার ভারাক্রান্ত। সন্ধ্যার বিমর্ষ ভাবখানা তাকে বড় কাতর করেছে। এদের সংগে ছোট সাহেবের কি সম্পর্ক? কেন ছোট সাহেবের জন্য এরা ব্যাকুল? ঠিক আত্মীয়তাও নয়—অথচ একটা গভীরতা আছে এ প্রচ্ছন্ন সম্পর্কে। নইলে অত অধীর হতো না সন্ধ্যা। মন্মথ ঠিক করে সে গিয়ে ছোট সাহেবকে বিশেষ ভাবে বলবে—এমন করে বলবে যে ছোট সাহেব তক্ষুনি ছুটে আসে।

মল্লিকা খুবই যত্ন করে মন্মথকে। কিছু দিন ধরে সে আফিসে যায় না—কেন যায় না তা মন্মথ জানে না। সে শুধু মাঝে মাঝে এটা-ওটা চিঠি পত্র নিয়ে আসে। বাইরে থেকেই হাতে দিয়ে বাইরের মানুষের মত প্রত্যহ বিদায় হয়। কিন্তু আজ মল্লিকা তাকে আর যেতে দেয় না। অভ্যর্থনা ক'রে ঘরে বসায়। মন্মথ একটু আশ্চর্য হয়।

'সত্যি সত্যি কি তোমাদের ছোট সাহেবের শরীর খারাপ?'

সরল মন্মথ বিপদ ঘটায়। 'না তো।'

মল্লিকার মুখে কে যেন কালি মেড়ে দেয়। 'তবে?'

'হ্যাঁ তো—একটু একটু কেমন যেন খারাপ।'

'কিছু না মন্মথ—কিছু না।' হঠাৎ গলার স্বর ভেঙে পড়ে মল্লিকার। যা মন্মথর কাছে বলা উচিত না, তাই বলে ফেলে। 'সন্ধ্যার কাছে গেছে আমার এখানে আসবেনা।'

মল্লিকার অবস্থা দেখে মন্মথ বলতে পারে না যে এ কথাও সত্য নয়। এমনিতেই সে একটা সত্য কথা ব'লে কি যে বিভ্রাট ঘটিয়েছে—আবার কিসে কি হয়!

'আমি আর এসব কাজে আসব না মল্লিকাদিদি—চিঠি পত্তর বড় ঝামেলার জিনিষ।'

'কেন তোমার কি দোষ হলো? তুমি আসবে বই কি এখানে। অমি বড় বিপদে পড়েছি।'

মন্মথ সাগ্রহ দৃষ্টি মেলে থাকে।

মল্লিকা উঠে গিয়ে একখানা পত্র লিখে দেয়। 'তুমি কিছু মনে করো না, আর কিছু বলো না তোমার ছোট সাহেবকে।'

মন্মথ উঠতে যায়।

'কিন্তু পত্রের জবাবটা যে আজই চাই আমার। অফিসে যেতে যেতেই তো চারটা বেজে যাবে।'

'যেখানেই ছোট সাহেব থাক, চিঠির জবাব নিয়ে আজই আমি দিয়ে যাব আপনাকে।'

'যদি রাত হয়।'

'হোক।'

'তাই করো মন্মথ। এ ঋণ আমি ভুলব না।'

'মল্লিকাদিদি, আমরাও মানুষ।'

এ কথায় মল্লিকার চোখে জল আসে।

মন্মথ ছোট সাহেবের কাছে গিয়ে সন্ধ্যার কথা বলতে ভুলে

যায়—মল্লিকাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার মন। একটা খাম নিয়ে ফের বিদায় হয় মন্মথ। সে সেইটা মল্লিকার হাতে দিয়ে সন্ধ্যার পর নিজের বাসার দিকে ফেরে। যাবার সময় সে দেখে গেল খামখানা ছিঁড়তেই কতগুলো শতকে নোট বেরিয়ে পড়ল। মল্লিকা বলে দিল সে যেন কাল একবার এদিকে অবশ্য অবশ্য আসে।

পরদিন ভোর বেলাই মন্মথ এসে হাজির হয়। মল্লিকা একটা ফর্দ তৈরি করে তার হাতে দেয়।

'আপনি যাবেন না?'

'না, তুমি এই জিনিষগুলো আমাকে কিনে এনে দাও।'

'আমি তো সব চিনিও না।'

'চেনার দরকার নেই—দোকানে গিয়ে ফর্দ দেখালেই দিয়ে দেবে।'

'আপনি চলুন না।'

'না মন্মথ। যদি তোমাদের ছোট সাহেব আসেন ফিরে যাবেন যে।'

'তাই নাকি? ছোট সাহেব আসবেন! তবে থাক, আমিই কিনে আনতে পারব সব। সময়তে তো কত জিনিষই কিনে এনে দেই ছোট সাহেবের।'

'ছোট সাহেবের কি কি জিনিষ তুমি কিনে এনে দাও মন্মথ?'

'এই তো মুস্কিলে ফেললেন আমায়—আমি কি নাম জানি, না চিনি ওসব।'

মল্লিকার বিষণ্ণ মুখখানায় একটু হাসি ফুটে ওঠে। এখন আবার তাকে ইন্দ্রাণীর মতই দেখায়। এদের মনে যে কেন মন্মথর অমন মধুরভাষী দয়ালু মনিবটি কষ্ট দেন—কি তার কারণ—সে তা বুঝেই উঠতে পারে না।

কথা আর বাড়ায় না মল্লিকা। সে ফর্দ এবং টাকা মন্মথর হাতে দিয়ে দোকানগুলোর নাম বলে দেয়।

ঘণ্টা তিনেক বাদে মন্মথ ফিরে আসে। বিস্তা বোঝাই মাল। প্রবাসে যাবার জন্যই যত সব সাজ সরঞ্জাম। বেড কভার, হোল্ডল, টিফিন ক্যারিয়ার—আরও যত রাজ্যের মাল।

'তোমাদের ছোট সাহেব তো এলেন না?'

মন্মথ মিছামিছিই অপ্রস্তুত হয়ে বলে, 'আসবেন মল্লিকাদিদি, আসবেন।'

'আমার তো সময় হয়ে এলো—আর এক ঘণ্টা।'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'জানি নে—গিয়ে চিঠি লিখব।'

'আমরা তো জানব না।'

'তোমার কাছেই লিখব মন্মথ। আমি আর কারুর কাছে লিখব না।'

'চাকরী?'

'সে তো ইস্তফা দিয়ে এসেছি।'

'কেন?'

'এমনি—ভাল লাগে না।'

যত রাজ্যের রহস্য ও বিস্ময় নিয়ে মন্মথ বাসায় ফেরে। চুপ করে আহার করে। কত চিন্তা করেও এমন একটি চাবি কাঠি পায় না যা দিয়ে এ রহস্যের দুয়ার সে খুলবে। যতটা সম্ভব সে প্রশ্ন করেছে—মল্লিকা উত্তরও দিয়েছে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি এই সরল মানুষটি। শুধু একটা অব্যক্ত ব্যথায় তার মনটা ভরে উঠেছে।

মল্লিকা বলেছে, 'আমি যখন থাকব না তখন মাঝে মাঝে এসে তুমি খোঁজ নিয়ে যেও। মা রইলেন—রইল তোমার দুটি ভাই যীশু ও বিশু।'

'কোথায় যাচ্ছেন ?'

'ঐ তো বললাম আমি জানিনে।'

'কেন যাচ্ছেন ? কিছুই বুঝতে পারছিনে। এখানের চাকরী ?'

'তোমার ছোট সাহেব আমাকে চান না।' মল্লিকা মৃদু হেসে বলে, 'জোর করে কি থাকা যায়—না বজায় রাখা যায় কিছু ?'

'না, তা তো পারা যায় না।' একটু চিন্তিত মনেই জবাব দিয়েছে মন্মথ। ছোট সাহেব তার মল্লিকাদিদিকে চায় না, অথচ টাকা দেয়। তখনও সে কিছু বুঝতে পারে নি এখনও কিছু আবিষ্কার করতে পারে না। কিন্তু ভুলতেও পারে না তার মল্লিকা-দিদির করুণ মুখখানি। স্বর্গের ইন্দ্রাণী যেন কোন অভিশাপে পাতালে যাচ্ছে। তারই যাত্রা পথের সাজ সরঞ্জাম জোগাড় করে দিয়ে এলো এই অভাগা মন্মথ।

আফিসে এসে মন্মথ বুঝল যে তার মল্লিকাদিদি তাকে বোকা বলদের মত কথার ঠুলি চোখে বেঁধে দিনকে রাত করে দেখিয়েছে। ঐ তো সে এসে বসেছে তার চেয়ারে—ছোট্ট টেবিলটির সুমুখে—ঐ তো তার স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রাণীদিদি।

মন্মথ এগিয়ে যায়।

ছোট সাহেব নিষেধ করেন, 'ও মল্লিকা নয়—নতুন মেম সাহেব, সেলাম করো মন্মথ।'

মন্মথ পুতুলের মত হাতখানা কপালে ঠেকিয়ে বেরিয়ে যায়।

আট

একদিন সৌদামিনী বলে, 'দিন রাত যে বসে বসে ঝিমাও, তোমার হলো কি ?'

'না তো, আমার কিছু হয়নি।' একথা একেবারে মিথ্যা। মল্লিকা গেছে অবধি মন্মথ এমন একটা আঘাতে ভুগছে যা সারেও না বাড়েও না। অথচ তার টাটানিও কমে না।

'কিছু হয়নি! তবে কি চোখে ছানি পড়েছে ?'

'কেন ?'

'দেখতে পাওনা যে কি হচ্ছে ?'

'দেখতে তো পাচ্ছি সব, কিন্তু বিশেস কি হচ্ছে তা তো বুঝছিনে।'

চাপা গলায় সৌদামিনী বলে, 'তোমার মেয়ে বেরিয়ে যাবে।'

'কেন ?'

'ঐ দেখো।' বলে সৌদামিনী আংগুল দিয়ে যা দেখায় তা পিতার কাছে অসহ্য। আবার কোথা থেকে যতীনটা যেন এসেছে, তার সংগে একটা কি প্রসংগ নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে শোভা। দৃশ্যটা একটু দূরে, খানিকটা আবডালেও পড়েছে একটা ভাঙা চালার। কিন্তু জ্বলে ওঠে মন্মথ।

'ডাকো শোভাকে।'

'এখন কেলেংকারী করো না—বস্তি শুদ্ধ সব লোক হাসবে।'

অগত্যা মন্মথ ক্রোধ সম্বরণ করে।

কিন্তু রাত্রে যখন যতীন মিষ্টি কথায় আপ্যায়িত করতে আসে মন্মথকে, তখন সে বসতেই বলে না। লম্পটটাকে এড়িয়ে থাকতে চায়।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে উসখুস করে নিজের মনে মনে যেন বলে, 'একটা কথা বলতাম মন্মথদা—ঘুমিয়েছ নাকি ?'

মন্মথ ইচ্ছা করেই উত্তর দেয় না।

'কথাটা শোভার সম্বন্ধে—তবে আজ থাকগে—এখনও তাড়াহুড়ার কিছু নেই।'

সৌদামিনী বিছানা ছেড়ে উঠে বসে। মেয়েলোক—সে কথাটা ঠিক ধরেছে। 'বোস ঠাকুরপো আলো জ্বালাই।' সৌদামিনীর আজই এই প্রথম আলাপ যতীনের সংগে।

'একটি ভাল ছেলে আছে, যদি—

'কোথায় ?'

'আমাদের আফিসে। মাইনে ষাট টাকা, অবস্থা এবং চাল চলন মন্দ না—চারটি ভাইই চাকুরে। তবে এটি ম্যাট্রিক।'

'বলো কি !' এবার মন্মথও উঠে বসে।

'তোমার মেয়ের খুব মত আছে। আমার কাছে ছেলে এসেছিল, ওকে দেখিয়েছি। ছেলেও মেয়ে দেখে গেছে। এখন তোমাদের স্বামী স্ত্রীর মত হলেই হয়। কিছু লাগবে না দাদা—পাঁচটি হরতকি দিয়ে ঘুরিয়ে দিলেই চলবে। যদি রাজী হও আমি সব করে-কুলিয়ে দিতে পারি।'

'ও শোভার মা।' আনন্দে মন্মথ আর কিছু বলতে পারে না।

সৌদামিনী বলে, 'গোদ দুখানা একটু টানো, বসতে দাও ঠাকুরপোকে।'

দু একবার মাত্র আসা যাওয়া; দুটি চারটি মাত্র কথা—সুপ্রতুল আর শোভার বিয়ে হয়ে যায়। যতীন ঘটক বিদায় বাবদ মাত্র এক বোতল মালের দাম চেয়ে নেয়।

দশ-বর্জনের পর মেয়ে জামাই চলে গেছে, একটু কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়েছে মন্মথ।

'ওকি? তোমার উচিত আনন্দ করা—আর কিনা গুম মেরে বসে রয়েছ। কত ভাগ্য বলো তো আমাদের!'

'ভাগ্য বই কি শোভার মা—সত্যিই ভাগ্য। কিন্তু আর একটু সুখী হতাম আজ যদি মিতাটা এখানে থাকত, কি তার ছেলে মেয়ে নিয়ে আসত। যা-ই জোগাড় করতে পেরেছি কজন লোক তো খেয়েছে—কিন্তু কেন যেন মনটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।'

যে একদিন আব্বাসকে হাতে-হাতে বেঁধে দিয়েছিল—কথাটায় সেই সৌদামিনীও নরম হয়ে পড়ে। মেয়ে বিদায়ের ব্যথার চেয়েও একটা বড় ব্যথায় তাকে অভিভূত করে রাখে।

একদিন নবীন মণ্ডলের বাড়ি থেকে খবর এলো, নবীন অসুস্থ। এখন যাবে, না একটু পরে যাবে, না আফিসের ফেরত দেখে আসবে তাই ভাবছে মন্মথ এমন সময় আবার সংবাদ এলো নবীন শুধু অসুস্থ নয় তার অবস্থা একেবারে সংগিন।

কিসের আফিস, কিসের কি, মন্মথ তখনই ছোটে। রাস্তায় গোটা কয়েক হোঁচট খায়। পায়ের দিকে আজ তার দৃকপাত নেই। কোনো রকমে গাড়ি ঘোড়া এড়িয়ে সে ছুটে চলে। নবীনের জন্য তার হু হু করে পুড়তে থাকে প্রাণ। কলকাতা সহরে মন্মথর

এমন একজন বন্ধু আর নেই। মন্মথ হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে নবীনের বাড়ি ওঠে। যা প্রত্যক্ষ করে তা আর বলার নয়।

নবীনের কলেরা হয়েছে।

মন্মথ ডাক্তার ডাকল। তার করণীয় যা তা করল কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। নবীন মারা গেল।

নবীনের ডিপার্টমেন্টের সব কাজ জানা ছিল মন্মথর। তার ডাক পড়ল এবং সে একরকম বিনা আয়াসেই হেড মিস্ত্রী হলো। সাধারণ কর্মচারীর পক্ষে এ এক অভাবনীয় ভাগ্য পরিবর্তন।

বিনা পয়সায় মেয়েটার একটা সুন্দর সম্বন্ধ হয়েছে, আবার বিনা আয়াসে চাকরীতে উন্নতি। সবদিক যেন ভরে উঠছে। হঠাৎ মন্মথর ভাগ্যটাকে তারিফ করতে ইচ্ছা হয়। বিশ্বাস দৃঢ় হতে চায় ঈশ্বরের ওপর। আবার ভক্তিতে মন ভরপুর হয়ে ওঠে। কিন্তু বুকটা কেমন যেন টনটনিয়ে ওঠে যখন নবীন মণ্ডলের বাসায় যায়—ওর বিধবা বৌটাকে দেখে। পরণে সাদা থান—কপালটা তার ধোয়া মোছা। এই নবীন মণ্ডলই তো তাকে একদিন কারখানায় ঢুকিয়েছিল, ছোট সাহেবের কাছে কাকুতি মিনতি করে—একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই সংগ্রহ করে দিয়েছিল ছুদিন অফিস কামাই করে।

প্রতিদানে ওর তো এমন কিছু করার ক্ষমতা নেই যে নবীনের বৌর একটা বিশেষ কিছু উপকার হবে। কী আর করবে, বিধবা বৌটা নাকি দেশে যাবে তার কোলের কাঁখের পোষ্যগুলো নিয়ে। দেশে নাকি দেওর ভাসুর আছে।

মন্মথ কিছু অর্থ সাহায্য করে। বেশি কিছু দিতে পারে না। দেবে কোথা থেকে? এই কদিন হলো তো মেয়ের বিয়ে দিয়ে

উঠল। গরিবের ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। ভগবানের একি লীলা! ভাগ্যের একি বিড়ম্বনা!

মন্মথ ভাবে : দুর ছাই, ভাগ্যটার কি এক পিঠ মেকি আর অন্য পিঠ সোনার জলে রং করা? ঈশ্বর কি এক চোখো? আর বেশি দোষারোপ করতে সাহস হয় না তার। সে সহজ সরল ভীতু মানুষ। আবার কিসে কি হয় কে জানে!

ফের যতীনটা দেখা দেয়। তার আজকাল সট্ ভেঙেছে। যখন তখন ঘরে দুয়ারে ওঠে। যা ইচ্ছা তাই নিয়ে যায়। সৌদামিনী একটু এলোমেলো থাকে। নিজের ঘরে এই দারুণ গ্রীষ্মে থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু সে সব সম্ভ্রম জ্ঞান নেই যতীনের। এর জন্য সৌদামিনী আবার বিরক্ত হয়ে উঠেছে যতীনের ওপর। কিন্তু লজ্জার মাথা খেয়ে কিছু বলতেও পারছে না। শোভার বিয়ের পর যতীন যেন সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু এ সুযোগ তার বন্ধ করতে হবে মন্মথকে বলে।

এমনি সব কথাই সেদিন ভাবছিল সৌদামিনী—মন্মথও নিকটে বসা—হঠাৎ উদয় হয় যতীন।

আগা নেই, গোড়া নেই, বলতে আরম্ভ করে, 'মেয়েটা সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী ছিল বলেই এত সহজে পার পেয়েছ, মন্মথদা। আর ভাল চিকিৎসা হয়নি বলেই নবীনটা মারা গেছে—এর ভিতর শুধু শুধু তোমরা টেনে আনছ বেচারা ঈশ্বরকে। থাকি পাশে সব কথাই তো শুনি।'

স্বামী স্ত্রীতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে—একটু অপ্রস্তুতও হয় যেন।

'ঈশ্বর আজও নেই কালও নেই। নইলে এমন কি ঘুষ দিয়েছ

তুমি যে হঠাৎ হেড মিস্ত্রী হলে, বরাত ফিরল তোমার ? একেবারে যেন দিন রাত ব্যবধান। তোমার ঈশ্বর ঘুষ খায় নাকি ?'

'না, না আমি তো তা চাইনি যে নবীন মরুক আর আমি—'

'মনে মনে তো বেশ একটু খুশি হয়েছ। আরে তুমি না হও তোমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজন তো হয়েছে। এর অর্থ সেই পরমার্থ যার বুনিয়াদের অভাবে তুমি আমি আজও কোল-কুঁজো। লজ্জার কিছু নেই মন্মথদা।'

কোনও জবাব দিতে পারে না মন্মথ। সে চুপ করেই থাকে।

রাত্রে নবীনের বৌকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসে মন্মথ অনেকক্ষণ ভারাক্রান্ত মনে কাটায়। মনে কত কি যে প্রশ্ন আসে তার কোন উত্তর খুঁজে পায় না। আয়ু থাকতে লোক মরে না, কিন্তু নবীন যেন মরল পরমায়ু থাকতেই। ডাক্তার ডাকায় ত্রুটি হয়নি বটে, কিন্তু ডাকা উচিত ছিল শেষ রাত্রে যখন প্রথম টের পায় ভেদ বমির।

'হ্যাঁ যতীন, ঘুমিয়েছ ?'

'না।'

'ভাগ্য নয় তো দায়ী কে ? নবীন মরল কেন ?'

'পরিজনের অজ্ঞতা। চিকিৎসার অভাব।'

'এও তো ভাগ্য।'

যতীন বাধা দেয়। 'যা ঠিক করেছ তা নয়। তোমাদের অজ্ঞ করে রাখা হয়েছে—যাতে ভাগ্যটা নিয়েই নাচানাচি করো—আসল কথার ধার দিয়েও না যাও।'

'কে রেখেছে যতীন, কে ?'

'সে আর একদিন শুনো আজ নয়।', বলে যতীন ওঠে।

'না, না—আজই বলতে হবে তোমাকে। মন্মথ একেবারে যতীনের খোপের কাছে গিয়ে হাজির হয়।

'বলব বুঝিয়ে দেব কিন্তু তোমরা মানবে না এই দুঃখ।'

'মানব যতীন আমি তো আর গোঁয়ার নই।'

'গোঁয়ারদের তবু গোঁ আছে, তোমাদের কিচ্ছু নেই।' একটা অন্যায়কে অন্যায় বলে স্বীকার করে নেওয়ার ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়েছ।'

'তুমি অত হেঁয়ালী না করে বুঝিয়ে বলো তারপর দেখে নিও।'

'বুঝিয়ে বলব কি, আমি ও তো সঠিক কিছু জানিনে। তবে মাঝে মাঝে এখানে-ওখানে যা শুনি তাই তোমার কাছে এসে বলি। বড় ভাল লাগে শুনতে, একেবারে মদের মত নেশা।'

'কি শুনে এসেছ আজ?'

'কংগ্রেসকে সাহায্য করো। দেশ স্বাধীন হবে, লেখা পড়া সকলেই শিখবে তখন কিচ্ছু বুঝতে কষ্ট হবে না। আরে তুমি দেখে শিখে না যাও, তোমার ছেলে মেয়েরা দেখবে—শিখবে। এই যে তোমার অপগণ্ডদের জন্য কি করলে ভাই মন্মথদা? এদের জন্য ব্যংকে টাকা রেখে যেতে পারবে না, জমি জমাও তেমন কিছু নেই। কংগ্রেসকে দাও, এক ভাবে তো কিছু কিছু জমাও—যে তোমাদের এই মজুর কুলি মিস্ত্রীদের ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যত 'নিরাপদ করে দেবে। আজও আমি শুনে এসেছি, আশ্বাস দিয়েছেন ঐ কে যেন এসেছেন দিল্লী থেকে—হবে নাকি কৃষাণ মজদুর রাজ।'

'আমি আর কি করব চাঁদা তো দিয়েছি তোমার কথামত।'

'এরপর কি করতে হবে না হবে, যাও, জিজ্ঞাসা করে এসো সেই বাবুকে যে তোমাকে রসিদ লিখে দিয়েছেন। তাঁরা সব জানেন আমি অত খুটিনাটি জানিনে।'

যতীন মদ খেতে আরম্ভ করে।

কিন্তু মাতাল হয় মন্মথ।

একটা সামান্য কারখানার মিস্ত্রী—বলতে গেল বর্ণপরিচয়হীন, প্রথম জীবনে ঠেলেছে বৈঠা লগি, এখন চালাচ্ছে হাতুড়ি—তার প্রাণে এলোমেলো আলোড়ন তুলে দিয়েছে। ছুটিয়ে দিয়েছে তার উপল প্রস্তর বহুল জংলা মনে একটা বল্গাহীন তেজস্বী অশ্ব—যেন স্বাধীনতার মূর্ত প্রতীক। এক সমাজ সংস্কারহীন ঘৃণ্য মাতাল করল কি? মন্মথ ঐ মুক্ত অশ্বের পিছু পিঁছু ধাওয়া করবে, সে জড়িয়ে ধরবে তার সুমসৃণগ্রীবা। সে বলতে পারে না, বোঝাতে পারে না—তাই তার অবরুদ্ধ ভাষা ব্যাকুল হয়ে ঘা মারে সারা বুকের পাঁজরে।

নয়

পরদিন সকালে উঠেই সৌদামিনী দেখে যে মন্মথ বাইরে বের হওয়ার উদ্যোগ করছে।

'কোথায় যাও ?'

'একটু কাজ আছে।'

'বাজারে যাবে না, আজ যে মেয়ে জামাই আসবে।'

'বড় খোকাকে পাঠাও।'

'বলো কি, তাকে দিয়ে কথনও হয় ?'

'হবে, হবে না কেন ? না হয় একটু খারাপই হবে—আমার জরুরী কাজ আছে।'

'কোথায় ?'

'তুমি চিনবে না—কংগ্রেস অফিসে।'

'চিনব না কেন—ঐ যে কাল যতীন বলব—মাতালের অফিসে! তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না ওখানে। নিজে পাঁড মাতাল আবার হুবুদ্ধি দিয়ে আর একজনকেও মজাতে চায়।'

মন্মথ আর না হেসে পারে না। 'এই তো বুঝেছ খুব। বলতেই বলে, যাকে দেখতে পারিনে—তার চলন মন্দ । একেই বলে অশিক্ষিত অজ্ঞ পাড়াগেঁয়ে।'

'আর তুমি বুঝি মস্ত একটা পণ্ডিত—সহরে হয়েছ কদিন হাতুড়ি চালিয়ে ? তাই ভোর না হতে মাতালের বুদ্ধি মত ছুটছ ? ওতে কোনও লাভ হবে না আমাদের।'

'না হয় না হোক। আমি কোনও স্ত্রীলোকের কথা শুনতে চাইনে।'

'তবে যাও!'

নর্দমাটা পেরিয়ে বড় রাস্তায় পা দিতেই মন্মথ বাধা পায়। যীশু ও বিশু এসে হাজির।

'মা তোমাকে একবারটি ডেকেছে মন্মথদা—এক্ষুনি যেতে হবে। দেরী করতে পারবে না।'

'তোমরা ভাল আছ তো?' দেখ না এই কদিন হলো নানা ঝঞ্ঝাটে তোমাদের ওখানে যেতে পারিনি।'

যীশু বীশু কোন জবাব দেয় না।

'তোমার দিদির কোনও পত্র পেয়েছ?'

'না।'

'সে কি!' এতক্ষণে মন্মথ লক্ষ্য করে যে দুটি বালকেরই মুখ বিষণ্ণ। এবং এমন বিষণ্ণ যে গত রাত্রে কিছু খেয়েছে কিনা সন্দেহ।

'আচ্ছা ভাই তোমরা আমার একটা কথা শুনবে?'

যীশু ও বীশু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। 'কি কথা মন্মথদা?'

'আমার বাড়ি নতুন এসেছ—একটু মিষ্টি মুখ করবে। এসো এই দোকানে।'

একটা মিঠাইর দোকানে মন্মথ যীশু ও বীশুকে নিয়ে ঢোকে। তাদের খাবার কিনে দেয এবং কথায় কথায় শোনে যে গত রাত্রে তাদের আহার হয়নি তবে তারা প্রহার খেয়েছে নির্বিচারে। মা নাকি বলেছে—ওদের খাওয়া পরার জন্যই আজ মল্লিকা কোথায় কোন্ দূর দেশে গেছে—এখন পর্যন্ত তার একখানা চিঠিও এলো না।

যীশু বলে, 'আমাকে একটা বিড়ির দোকানে ঢুকিয়ে দেবে মন্মথদা ?'

বিশু বলে, 'আমাকে আড়াই সের বাদাম কিনে দাও, আমি ফেরী করব।'

তবে এসব আলোচনাও কাল হয়েছে। জীবন ধারণের কঠিনতম লাঞ্ছনার ছাপও এদের মনে পড়েছে! এবং সে ছাপ বাধ্য হয়ে এঁকে দিয়েছে, ওদের মা!

এই কি তার সেই কল্পলোক-বাসিনী ইন্দ্রাণী দিদির ভাইরা!

মন্মথ নিজের অধীরতা নিজেই দমন করে বলে, 'মা বাবা রাগ করে কত কথা বলে ভাই—তা কি মনে রাখলে চলে!'

'মা যে বলল চাল নেই।'

'দাদা আনবে চাল—আর আমি আনব তেল, নুন, বাজার। নইলে দাদা একা পারবে কেন ?'

মন্মথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। আর বাড়িতেও তেমন কিছু সঞ্চয় নেই। হাতে তার বহুদিনের পুরান একটা আংটি ছিল—আনা তিনেক ওজনের, রূপা মিশ্রিত সোনা। সে তাদের ফুটপাথে দাঁড় করিয়ে একটা স্যাকরার দোকানে ঢোকে।

যীশু নিবিষ্ট মনে পাশের বড় বিড়ির দোকানটার দিকে চেয়ে থাকে।

বিশু এগিয়ে যায় একটা বাদাম ভাজাওয়ালার কাছে। সে লক্ষ করে ভাজাওয়ালা কি করে একটা বড় হাতা দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাজছে বাদাম।

মন্মথ দোকান থেকে বেরিয়ে আসে এবং বাজারে যায়।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই একটা রিক্সা বোঝাই নানা প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে সে ফেরে। যীশু বিশুকে ডেকে রিক্সায় তুলে দিয়ে নিজে হেঁটে চলে।

মল্লিকার মা বলে, 'এ সব কি মন্মথ ?'

'কিছুই না। যা দেখছেন তাই।' বলতে বলতে মন্মথ জিনিসগুলি নামায়।

'কত দাম হয়েছে ?'

'ন'টাকা বার আনা।'

'এই নাও।' বলে সে একখানা দশ টাকার নোট বের করে দেয়।

মন্মথর কেমন যেন লাগে। টাকা পেল কোথায় ?

'মল্লিকা চিঠি লিখেছে মন্মথ।'

'কি লিখেছেন মা ? ভাল আছেন তো ?'

'হুঁ। তোমার কাছেও একখানা চিঠি দিয়েছে। আমি ছিঁড়িনি খামখানা। এই কদিন থেকে কি যে ভুলো মন হয়েছে মেয়ের। ঘরে টাকা রেখে গেছে, অথচ বলে যায়নি।'

মন্মথ পড়তে পারবে না। সে তা অনুমান করে বলে যে আর তার দেরী করার উপায় নেই—অফিস যেতে হবে, এখন সে চলল আর এক সময় আসবে। 'কই দেখি চিঠিখানা ?'

কারখানায় সে আর এক ঘণ্টা দেরী করে গেলেও তার কেউ কৈফিয়ৎ চাইবে না—তবু তার ব্যস্ততা—ব্যস্ততা নয় অধীরতা—বড় অধীর হয়েছে সে তার ইন্দ্রাণীদিদির চিঠি পড়ার জন্য। চিঠিখানা যত্ন করে সংগে নিয়ে চলে। মন্মথ অফিসে না যেয়ে বাড়ি ফেরে।

'যতীন, যতীন !'

'কেন মন্মথদা ? বড় ব্যস্ত যে—ব্যাপার কি ?'

'একখানা চিঠি পড়ে দাও, হাতের লেখা, আমি চোখে ঠাহর পাচ্ছিনে।'

'এ যে রীতিমত সুগন্ধি খাম'।' যতীন ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করে, 'কার চিঠি ?'

'একটি মেয়ের।'

দড়মার বেড়ার আবডালে ঠিক ওপাশেই খন্তি হাতে উৎকর্ণ হয়ে থাকে সৌদামিনী।

'শেষকালে তুমিও মন্মথদা আমার মত খাতায় নাম লেখালে।'

'ছিঃ ছিঃ কি যে সব বলো। আমার চেনা একটি ভদ্র লোকের মেয়ে।'

সৌদামিনী ঝটিতি এসে বাজ পক্ষিনীর মত চিঠিখানা কেড়ে নেয়। 'কে ভদ্দর নোকের মেয়ে নামটা তার শুনি।'

সৌদামিনীর হাবভাব দেখে মন্মথ তটস্থ হয়ে যায়। 'চিঠিখানা দাও, দাও—বলছি।'

'চিঠি দেব আগুনে—আগে নাম বল। ঠাকুরপো, আমি অনেক আগেই বুঝেছি। না হলে জামাই মেয়ে আসবে তা ফেলে কেউ কি যায় ঐ মাতালের অফিসে ?' এমন সময় সৌগন্ধটা সৌদামিনীর নাকে যায় ! সে আরও তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠে। এঁটো হাতেই চিঠিখানা ছিঁড়ে উনানের দিকে ছোটে।

মন্মথ তাকে ধরে ফেলে। 'কর কি কর কি—মল্লিকা দিদির চিঠি।

'শোন ঠাকুরপো শোন—একটা যাকে তাকে দিদি বলে ভাঁওতা দিচ্ছে।' সৌদামিনী কেঁদে ফেলে।

যতীন বলে, 'তুমি অস্থির হয়ো না বৌদি—অস্থির হয়ো না। আগে চিঠিখানা পড়েই দেখো।'

'ছাই পড়ব—তোমরা পড়ো—আমি আজই জামাইকে নিয়ে দেশে যাব।'

কড়াইয়ের মাছগুলো প্রায় পোড়া লাগে—লোকও জমে গেছে তিন চার জন। মন্মথ দাওয়ায় উঠে কড়াইটা নামায়। যতীন সৌদামিনীকে শান্ত করবার অছিলায় নিজের ঘরে নিয়ে যায়।

প্রতিবেশী কে যেন জিজ্ঞাসা করে, 'কি হয়েছে শোভার বাপ? কাঁদছে যে তোমার স্ত্রী?'

মন্মথ মহা বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়, 'শোভার মা বিধবা হয়েছে।'

যারা এসেছিল তারা আহাম্মক হয়ে চলে যায়। এ কলকাতার সহর—গ্রাম হলে রেশ মিটত না তিন দিনে।

কি যেন কি কারণে সেদিন আর মেয়ে জামাই আসে না। রাত্রে যতীন অতি কষ্টে জোড়াতালি দিয়ে মল্লিকার পত্রখানা মন্মথকে পড়ে শোনায়।

মন্মথদা,

আমি ভাল আছি। কিছু টাকা বাক্সে রেখে এসেছি। আসার সময় ভুলে গেছি মার কাছে বলে আসতে। তাকেও চিঠি দিলাম। তুমিও জানলে। এখন আমি নিশ্চিন্ত হলাম আমার সংসার সম্বন্ধে। কি বলো?

তুমি কখনো ছোট সাহেবকে ছেড়ে যেয়ো না—অন্তত আমি যতক্ষণ না এসে পৌঁছাই।

হঠাৎ এ কথার অর্থ কি? সে কেন ছাড়বে ছোট সাহেবকে? মন্মথ একটু অন্যমনস্ক হয়। যতীন থামে। যদি ছোট সাহেব মন্মথকে ত্যাগ করে? এমন উদাহরণ আজ আর বিরল, কিম্বা অসম্ভব বলে মনে হয় না মন্মথর কাছে। তবু মন্মথ তাকে ছাড়বে না যতদিন না মল্লিকাদি এসে পড়ে।

যতীন আবার আরম্ভ করে—

আমি ছিলাম কারখানার কেরাণী—মাইনে ছিল পঁচাত্তর। তুমি একজন হেড মিস্ত্রী, মোট-মাট পাও ষাট। ছোট সাহেবের সংগে আমাদের সম্পর্ক প্রায় সমান। তাই তুমি আমার বড় ভাই, আমি তোমার ছোট বোন। এ আত্মীয়তা অর্থের কিম্বা স্বার্থের নয়। তাই যেন কখনো ভাঙে না। আমি ভাল থাকলেও দূরে আছি। তুমি আমার মা ও ছোট ভাই দুটির দিকে একটু নজর দিও।

ইতি—

তোমার মল্লিকাদি

এ চিঠি সৌদামিনীকে বোঝাতে যতীনের অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়।

তাই রাত্রি যত বাড়ে সৌদামিনীও তত ঘুমের ঘোরে এগিয়ে যায় মন্মথর কাছে।

মন্মথর সেদিকে লক্ষ্য নেই। সে বিছানা ছেড়ে ওঠে এবং বাইরে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। বস্তির ও ফুটের রেডিও-গুলো থেমে গেছে—গেটের বড় আলোগুলোও নিবেছে। শুধু মশা ভ্যানভ্যান করছে এপারের বস্তিময়। একটা দুর্গন্ধ আসছে নাকে।

ডাষ্টবিনের কাছে একটা কিসে যেন নিমন্ত্রণের এঁটো পাতা হাঁটকাচ্ছে একটা কুকুর। মন্মথ কি ভেবে যেন তাড়া দিল। কুকুর নয়—একটা মানুষ! দূর, দূর। ব্যাটাব চোখে এখনও ঘুম নেই।

ওপারের নিরালা বাড়িগুলোর ভিতর থেকে একটা ঘড়ির জলতরংগ বাজনা শোনা গেল। তারপর মিষ্টি দুটি শব্দ হলো—রাত দুটো।

মল্লিকার সমস্ত গতিবিধির জটিলতা এখনও পরিষ্কার হলো না মন্মথর কাছে। শুধু তার বুকের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে ফুটে রয়েছে একটি বিষন্ন নারী মূর্তি। তারই পাশে, আজ আবার আর একটি বিষার্দিতা ম্লান মুখ এসে ভিড় করল—এ যে তার সন্ধ্যাদিদি। মন্মথ অনেক দিন ভুলেছিল এ মুখখানা।...

দশ

দূরে বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত করাতের কলের আর্তনাদ। কুলি, মজুর, মিস্ত্রিদের হৈ চৈ। কাঠের গুঁড়োর গন্ধ ভাসছে হাওয়ার সংগে। রৌদ্রের তাপ বিষম। কারুর কারুর কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠতে হয়। দমাদম লরি থেকে লগ্‌গুলো খালাস হচ্ছে। ঘর্মাক্ত মজুররা যেন রেগেই রয়েছে।

কিন্তু শব্দ এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রকোষ্ঠে একটু হাসলেন ছোট সাহেব। বললেন, 'মৃদুলা, ইনি আমার একজন বন্ধু—রেডিও আর্টিষ্ট, আই মিন সিনেমা আর্টিষ্ট। হয়ত নাম শুনেছ—সৌম্যেন বোস।'

মৃদুলা টাইপ রাইটার থেকে হাত গুটিযে এনে একটু আধুনিক প্রথায নমস্কার করল। তারপর একটু মধুর হাসি হাসল।

'আর মৃদুলার পরিচয় হয়ত তোমাকে দেওয়া বাহুল্য। দেখছই তো দেবী সিংহাসনারুঢ়া। বড় মিষ্টিগলা। দেবী সংগীতজ্ঞা। আশা করি তুমি এর প্রতিভা বিকাশে সহায়তা করবে। আমি তাই চাই সৌম্যেন। কত ফুল যে আঁধারে ফুটে, আঁধারেই ঝরে যাচ্ছে!'

সৌম্যেন প্রতি নমস্কার করে বলল, 'তোমার গুণগ্রাহী মন—তুমি চিরদিনই যত অখ্যাত অবজ্ঞাত দরদী শিল্পীকে চয়ন করে মানুষের সভায় এনে স্থান দিলে!'

'আমি আর একা একা কতটুকু পারি, আমার ক্ষমতা ও অবকাশের সীমা আছে। তাই তো তোমাকে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাই।'

ছোট সাহেব থামলেন। মৃদুলা দেখল : সত্যই সৌম্যেন সুপুরুষ—যেন পার্থ সারথী। মৃদুলা শুধু দেখল না, বিভোর হয়ে দেখল।

সৌম্যেন বলল, 'তুমি যদি ভাই একটা সিনেমা কোম্পানী খুলতে, কিছু ইনভেষ্ট করতে,—তোমার উচিত ছিল তাই।'

'কতবার তো পরামর্শ করলাম, কিন্তু হয়ে উঠল না।'

'আমায় সহযোগিতার কি কোন অভাব দেখেছ?'

'না—তা কখনো দেখিনি।'

'তবে?' সৌম্যেন মৃদুলাকে লক্ষ্য করে বলে, 'তবে বলুন তো আপনি আমি আর কি করতে পারি।'

'কত টাকার দরকার—প্রথম ষ্টার্ট দিতে।'

'লাখ খানেক।'

'টাকা তো তেমন বেশি কিছু নয়।'

ছোট সাহেবের মন্তব্যে মৃদুলা একটু অবাক হয়ে গেল।

'মুনাফা এবং সবদিক হিসাব করতে গেলে এমন সেফ্ এ্যাণ্ড সাউণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট আর জগতে নেই। তারপর শিল্পানুরাগীর পক্ষে মনের খোরাকও আছে যথেষ্ট। দেশের বহু তরুণ প্রতিভাকে আবিষ্কার করে তোলারও এই এক অভিনব পথ। তোমরা হয়ত এখনই বিশ্বাস করবে না সুযোগ এবং সুবিধা পেলে এই যে মৃদুলা দেবী, ইনিও ভারতজোড়া নাম করতে পারেন।'

'ভারতজোড়া বলছ সৌম্যেন—আমি বলি জগৎজোড়া। তুমি ওর কণ্ঠ সংগীত শোননি।'

'সে সুযোগ তো আমার হয়নি।'

'আজ তা হলে একটা অ্যারেঞ্জমেণ্ট করো না—ব্যারাকপুর, আমাদের বাগান বাড়িতে।'

'মন্দ কি। চমৎকার প্রপোজাল।'

'সেখানে বসে বাকিটা পরামর্শ করা যাবে।'

'কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করা দরকার?'

'তা তুমি বুঝে করবে। তোমার তো সবাই জানা আছে —অবশ্যি আমার একটু সাজেসন নিও।'

সৌম্যেন সোৎসাহে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়—প্রথমই হাত জোড় করে বলতে আরম্ভ করে, 'মৃদুলা দেবী—'

'আমাকে আর বলতে হবে না সৌম্যেন বাবু—আমি অতিথি নই।'

'তবে এখন উঠি ভাই ছোট সাহেব—বিকাল পাঁচটায়, ব্যারাকপুর।'

সৌম্যেন চলে যেতে মৃদুলা বলে, 'আপনার বন্ধুটি বড় উৎসাহী।'

'তোমারও কি কম উৎসাহ মৃদুলা—আবেগ এবং অধীরতায় তুমি সৌম্যেনকে হার মানিয়ে দিয়েছ।'

'তা আবার আপনি লক্ষ্য করলেন কখন?'

'তুমি যখনই অতিথির না হয়ে গৃহস্বামীনীর দায়িত্ব নিলে।' ছোট সাহেব একটু মুখ মচকালেন।

মৃদুলা একেবারে লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

ছোট সাহেব আড় চোখে তা লক্ষ্য করেন।

সেদিন আর মৃদুলার কাজে মন বসে না। কেবলই সে ঘড়ির দিকে চাইতে থাকে। ছোট সাহেব তা বুঝতে পেরে বললেন, 'তুমি বাসায় যাবে না? ড্রাইভারকে ডেকে দেই—একটু তাড়াতাড়ি জোগাড় হয়ে এসো।'

মৃদুলা উঠে দাঁড়ায়।

এগার

ব্যারাকপুরের বাগান বাড়ি।

সবে শীত গিয়ে বসন্ত আসছে। বাগানে অর্দ্ধস্ফুট ও সদ্য ফোটা নানা ফুলের রঙিন সমারোহ। গন্ধ এবং গুঞ্জরণে আকাশ বাতাস অধীর। ফটকের পাশেই একটা প্রসস্ত দিঘী।

মৃদুলা বলল, 'সৌম্যেন বাবু, আচ্ছা এ সব জোগাড়-যন্ত্র করে ষ্টুডিওর কাজ আরম্ভ করতে প্রায় একবছর কেটে যাবে, কি বলেন?'

'সমস্ত ছোট সাহেবের ওপর নির্ভর। যেমন টাকা ব্যয় করবেন কাজের গতিও তেমনি হবে।'

'আচ্ছা ষ্টুডিওটি দেখতে কেমন হবে?'

'সে এখন কি করে বলি! তবে আমি যা প্ল্যান করেছি তাতে ভারতের বিখ্যাত ষ্টুডিওগুলোর পাশে এখানাও দাঁড়াতে পারবে। যদি আপনার সাহায্য পাই তবে হয়ত আরও ভাল হতে পারে। আপনি যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

'নিশ্চয় পারেন।'

'আপনার কণ্ঠসংগীত অপূর্ব। একটু আগে যে গানখানা শুনলাম তা মর্তের মানুষের গলা নয়—যেন...'

'সৌম্যেন বাবু এ প্রসংশা আপনার আন্তরিকতার স্পর্শে ছোঁয়া —কিন্তু আমার যে পরোক্ষে ক্ষতি হচ্ছে।'

'যা বলছিলাম—আপনি কি নাচতে জানেন ? আপনার অংগের ছন্দে যে তাই বলছে।'

'সামান্যই শিখেছিলাম, কিন্তু তা কি আপনাদের পছন্দ হবে ?'

'হবে মৃদুলা হবে।' ছোট সাহের প্রবেশ করেন। 'শুধু আমাদের নয় সারা ভারতের বুকে তোমার নাচে আলোড়ন আনবে।'

ছোট সাহেবের মন্তব্যে একটু কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে মৃদুলা। সেই সময় আর তিনটি সুবেশ তরুণ প্রবেশ করে। দেখে মনে হয় তাদের প্রত্যেকই বেশ সংগতিসম্পন্ন। ছোট সাহেব সকলের সংগে সকলকে পরিচয় করিয়ে দেন।

'ইনি রায় সাহেব হরিশ্চন্দ্র মিত্রের ছেলে—মমতা মাইনিংয়ের স্বত্বাধিকারী।'

'ইনি একজন প্রফেসার—সদ্য বিলাত এবং আমেরিকা ঘুরে দেশে এসেছেন। হিউম্যানিজম সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখে ইনি আমেরিকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন।'

প্রফেসার একটি সূক্ষ্ম বিনয়ের হাসি হাসেন।

'ইনি সিনেমা রসিক—মহব্বৎ খাঁ। বহু ধান-জমির মালিক। গোটা কয়েক চালের কলও আছে এঁদের। প্রতি বছর বহু গরু বাছুর এঁরা আমদানী রপ্তানী করেন দেশ বিদেশ থেকে।'

মৃদুলা একটু বিস্মিত হয়ে নমস্কার করে। 'ইনি মুসলমান !'

'হ্যাঁ মৃদুলা। মুসলমান হলেই আর গুণ্ডা হয় না। মুসলমান জগতের শ্রেষ্ঠ কবি। তার নিদর্শন তাজমহল।

'কালের কপাল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এক বিন্দু নয়নের জল
এ তাজমহল।'

মৃদুলা ও সৌম্যেন অবাক হয়ে শোনে ছোট সাহেবের আবৃত্তি। মৃদুলার মনটা একটু খুট করে উঠলেও সে কিছু বলে না। বলতে সাহস পায় না। হয়ত তারই ভুল হয়েছে শুনতে।

মহব্বৎ ভাল বাংলা বোঝে না। গরু ধানী-জমি এবং তাজমহলের কথা শুনে একটু একটু হাসতে থাকে। এ তার প্রশংসারই কথা বটে।

সন্ধ্যার পর সিনেমা সম্বন্ধে নানা প্রসংগের আলোচনা হয়। কে কতটা শেয়ার কিনবে, কেমন করে আর্টিষ্ট জোগাড় হবে, কে কে ম্যানেজিং বডিতে থাকবে—এমনি হাজারও প্রসংগ।

সৌম্যেন এসব আলোচনায় যোগ দেয় যখন একান্ত জরুরী কথা ওঠে। বাকি সময়টা সে মৃদুলার মুখের প্রফাইলটি লক্ষ্য করে দেখে। যেমন কণ্ঠ তেমন শ্রী। সোনায় সোহাগা। এখন কাঞ্চনের তোড়াটা খুললেই হয়।

সৌম্যেন বলে, 'আমি সাকসেস্ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ।'

ছোট সাহেব বলেন, 'আমি এবার কিছুতেই আর সংকল্পচ্যুত হব না।'

মহব্বৎ বলে, 'বাইজী রাজী হোনেসে হাম লাখ রুপেয়া কা গৌ আউর ধান বেচেঙ্গা।' তারপর বুঝিয়ে বলে যে গরু ষাঁড়ের

ব্যবসা থেকে এ ব্যবসাটা নেহাৎ মন্দ নয়, অন্তত ধুলো ময়লার ভয় নেই। সব আর্টিষ্ট নিয়ে চলা-ফেরা।

মৃদুলা একটু অপমান বোধ করে।

ছোট সাহেব তাকে বুঝিয়ে বলেন যে পয়সাওয়ালা পার্টনার, দু একটা হ্যাংলা-বাঙলা বললে ধরতে নেই।

সেদিন একখানা গানের পরই সভা ভংগ হয়। নাচ দেখা আগামী সোমবারের জন্য মুলতবি থাকে। সেদিন দোলোৎসব, জমবে ভাল। আর আজ মহব্বৎ খাঁ বেশি দেরি করতে পারবে না। সে কোথায় যেন এক চালান গোময় সার পাঠাবে।

ছোট সাহেব ধীরে ধীরে বলেন, 'মৃদুলা তুমি ভেব না। সংগগুণে এমন যে গাধা সেও মানুষ হয়।'

প্রফেসার ছোট সাহেবকে একান্তে ডেকে বলেন, 'শুধু শুধুই গাড়ি বোঝাই করে হুইস্কি-গুলো আনা হলো। তুমিও ভাই হিউম্যানিটির কদর বুঝলে না।'

'সব হবে বন্ধু, একটু সবুর। মদ যত পুরান হয় ততই তার তেজ ও মধুরতা বাড়ে। আগামী সোমবার।'

প্রফেসার ক্ষুণ্ণ মনে বলেন, 'আচ্ছা।'

বার

মল্লিকা কলকাতায় ফিরে এসেছে।

মন্মথ একটু আশ্চর্য হয়ে গেছে। 'বিদেশে গেলে লোকের শরীর ভাল হয়, আর আপনার দিকে দেখি চাওয়া যাচ্ছে না।'

মল্লিকা একটু ম্লান হাসি হাসে।

'তুই যে হাসছিস বড়? তোর দিকে তো আমিও চাইতে পারছিনে।'

একটা বালিশের ভিতর থেকে কতকগুলো তুলো বের করে নিলে বালিশটা যেমন শ্রীহীন ও ঢিলে দেখায় বাস্তবিক তেমনি দেখাচ্ছে মল্লিকাকে।

'তোমাদের ফেলে গেছি, সংসারের চিন্তা, শরীর একটু খারাপ হওয়া স্বাভাবিক বই কি! যাক তুমি পারলে একটু চা খাওয়াও।'

'মন্মথ তুমি খাবে না?'

'একটু খাব বই কি মা।'

মন্মথও চায় একটু একান্তে বসে আলাপ করতে।

'তোমার কি হয়েছে মল্লিকাদিদি—আমার কাছে গোপন করলে ভাল হবে না।' মনের আবেগে হঠাৎ আজ মন্মথ একান্ত আপনার জনের মতই প্রশ্ন করে।

কিন্তু মল্লিকা একটু তিক্ত কণ্ঠে জবাব দেয়, 'তোমরা সবাই মিলে যদি আমাকে পাগল করে তোল তবে আমি আজই আবার চলে যাব। গরিবের ঘরের আমার মত দশ জন মেয়ের যা হয়, আমারও তাই হয়েছে। আমার অসুখ করেনি, আমি মরব না, তোমাদের পায়ে পড়ি, ব্যস্ত হয়ো না।'

মন্মথ কিছু বুঝতে পারে না—আর তার কিছু জিজ্ঞাসা করতেও সাহস হয় না।

অনেকক্ষণ নীরবে কাটে। চা আসে, চা খাওয়া হয়ে যায়। মন্মথ উঠতে চায়।

'রাগ করলে মন্মথদা?'

'না দিদি।'

'তবে যে উঠছ?'

'আফিসে যাব—প্রায় নটা বাজে।'

'তবে যাও। আবার বিকেলের দিকে একবার পারলে এসো।'

'পারব না কেন—নিশ্চয় আসব।'

মন্মথ দরজা খুলে বার হবে এমন সময় মল্লিকা বলে, 'একটু দাঁড়াও।'

'কোন চিঠি পত্র দেবে?'

'না।'

তবু মন্মথ দাঁড়িয়ে থাকে। কি যেন মল্লিকার বলা হলো না, কি যেন তার বুকের ভিতর গুমরে গুমরে উঠছে—তাই সে একটু অপেক্ষা করে।

কিন্তু মল্লিকা কিছু বলে না।

হায় মল্লিকাদিদি, তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে তবু মুখে কিছু বলতে পারছ না! মন্মথ ভাবতে ভাবতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

যীশু বিশু এসে বলে, 'দিদি আমরা কি আর ইস্কুলে যাব না?'

দুটি ভাইকে বুকে জড়িয়ে ধরে মল্লিকা উত্তর দেয়, 'কেন যাবে না? তোমাদের জন্যই তো আমার সব।'

'আবার যে মাইনে বাকি পড়েছে।'

'আজ আমি দিয়ে দেব। তোমাদের চিন্তা কি?'

'দিদি তুমি বড্ড শুকিয়ে গেছ।'

কিন্তু মল্লিকা মনে মনে বোঝে যে এ শরীর আর তার কখনো ফিরবে না। তাতেও তার দুঃখ ছিল না, যদি সে সঠিক বুঝতে পারত যে ভ্রমরকে সে তার মধুকোষে বাঁধতে পেরেছে। কিন্তু তা বুঝি সম্ভব হয় নি। সে বুঝি ঠকেছে!

অবৈধ দায়িত্ব থেকে সে উদ্ধার পেয়েছে সত্য কিন্তু হাল্কা হতে পারেনি এতটুকুও।

মন্মথ আফিসে গিয়ে একটা কাজের ফাঁকে ছোট সাহেবের কামরায় যায়। মৃদুলা শুনতে না পায় এমনি অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, 'মল্লিকাদিদি এসেছেন।'

'বলো কি—কবে এলো?'

'কাল।'

'কেমন আছে? একবারটি আমাকে তো খবর দেওয়া উচিত ছিল। আমি কত চিন্তায় ছিলাম।'

মন্মথ ইচ্ছা করেই মল্লিকার ত্রুটি সংশোধন করে—মিথ্যা হক, তবু বলে, 'আমাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন একবারটি যেতে।'

'যাও মন্মথ—এখন গোলমাল করো না, আমি সময় মত যাব।'

ছোট সাহেবও ধীরে ধীরে জবাব দেন, মন্মথও নীরবে বেরিয়ে আসে।

বিকাল বেলা সবই শোনে মল্লিকা। প্রথমবার সে যে চাঞ্চল্য

প্রকাশ করেছিল, এবার তা একেবারেই করে না। ছোট সাহেবকে যে সে চেনে তাও মনে হয় না তার হাবভাবে। মন্মথ ভেবেছিল একটু প্রশংসা পাবে, একটু হাসি দেখতে পাবে মল্লিকার মুখে, কিন্তু সে গম্ভীর হয়ে রইল সারা বিকালটা।

মন্মথ টের পেল না কিছুই। ওরই মধ্যে দুর্বল মন কেঁপে উঠেছে মল্লিকার। যেমন খর রৌদ্রের পর নব কিশলয় একটু জল পেলে প্রাণ প্রবাহে স্পন্দিত হয়ে ওঠে।

সে সারা বিকালটাই অপেক্ষা করে। যতই কাঁপুক দুর্বল হৃৎপিণ্ড সে একটা বালিশ নিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে।

দিন যায়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। কলকাতার ঘরে দুয়ারে রাস্তায় আলোগুলো জ্বলে ওঠে—জ্বলতে থাকে বৈদ্যুতিক বাতিগুলি ট্রামে বাসে। মন্মথ বিশেষ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। ব্যাপার কি! বলে দিলেন আসবেন, অথচ এলেন না!

সে উঠে গলিপথ ধরে কয়েকবার বড় রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসে—আবার যায়। ছোট সাহেব না আসায় লজ্জাটা যেন তারই পেতে হচ্ছে। কেন সে এমন একটা সংবাদ এনে দিল মল্লিকাকে? সে ভাবে আর মল্লিকার সংগে দেখা না করে বাড়ি চলে যাবে। কেমন করে আর সে এমুখ দেখাবে? মল্লিকা মুখে কিছু বলছে না, কিম্বা বলবে না, কিন্তু মনে মনে কি ভাবছে? ছিঃ ছিঃ এমন কাজও করলেন তার মনিব!

ছোট সাহেব এলেন না—মল্লিকাই একটু সাজ-গোজ করে বেরিয়ে পড়ে।

মন্মথ লজ্জায় একটা গ্যাস পোষ্টের আবডালে দাঁড়িয়ে থাকে। মল্লিকা তাকে দেখেও না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে যায়।

যেমন নিজের সাজ-সজ্জার জন্য একটু লজ্জা বোধ হচ্ছিল তার তেমনি নিষ্কৃতি দিয়ে গেল নিরপরাধ মন্মথকে।

মল্লিকা একখানা ট্যাক্সি ডাকল।

'কোথায় যাবেন ?'

'গঙ্গার পারে—কেল্লার পেছনে।'

ট্যাক্সি ছুটল।

গঙ্গার এপার ওপার আলোর মেলা—মানুষের গড়া তারার খেলা যেন। বাতাস বইছে ঝির ঝিরিয়ে। ষ্টীম লঞ্চ ছুটোছুটি করছে যাত্রী নিয়ে। ছোট বড় নৌকা চলছে অগুণতি। ভাটিয়ে যাচ্ছে ঘোলা জল দক্ষিণে।

প্রায় প্রত্যহ এখানেই তো আসেন এই সময়। এখানের প্রতিটি বস্তু মল্লিকা ভাল করে চেনে। ওপারে কটা মিল, কটা ক্রেন তাও একদিন গোনা ছিল মল্লিকার। চেনা ছিল উঁচু উঁচু কেল্লার টিপিগুলি। আজও সে কিছু ভোলেনি, ভোলেনি প্রিয়জনের কম্প্রকণ্ঠ।

'আমি কি তোমাকে ভুলতে পারি মল্লিকা! না, না তা কখনও পারিনে।'

-কিন্তু ভুলে তো গেছেন সব। এ হয় কেন? এমন মানুষ মানুষকে ঠকায় কেন, আর একজন ঠকেই বা কেন? দিগন্তের দিকে চেয়ে মল্লিকা প্রশ্ন করে। হেঁয়ালীর মত যেন জবাব আসে 'কেন, কেন ?'

একটা ভ্রান্ত আশা বুকে নিয়ে শুধু শুধু মল্লিকা ঘোরে। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একজায়গায় বসে, আবার উঠে উঠে পায়চারী করে।

অবশেষে এক সময় মর্মাহত হয়ে সে বাসায় ফিরে আসে।

তের

আজ হোলি-উৎসব—মহা আনন্দের দিন।

ব্যারাকপুরের বাগান বাড়িখানা সুন্দর করে সাজান হয়েছে। গেটের সুমুখে তোরণ, তোরণের সুমুখে মংগল-কলসী। দেওদারু পাতাও নানা রঙিন ফুলে অপূর্ব দেখাচ্ছে।

বড় হল ঘরখানা যতদূর সুন্দর ও সুরুচি সম্মত করা যায় তাতে ত্রুটি করা হয়নি। মাঝে মাঝে আর্টিফিসিয়াল কুঞ্জ এবং একটি সুন্দর ঝরণা ও পাহাড় তৈরি করা হয়েছে অনেক পরিশ্রম করে। দিন তিনেক ধরে সৌম্যেন এখানেই পড়ে আছে, এই সব নিয়ে।

মৃদুলা এসে ঘরে ঢুকেই অবাক। সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়ে—হয়ত থিয়েটার সিনেমায় এমন অনেক দৃশ্য সে দেখেছে, কিন্তু নিজেদের ঘরোয়া আনন্দ উপভোগ করতে যে এত পয়সা ও সময় কেউ ব্যয় করতে পারে সে তা ধারণাই করতে পারে না।

প্রবেশ পথের নাম হয়েছে "মহব্বৎ তোরণ"।

'সৌম্যনবাবু, আপনার রুচিবোধ উচ্চাংগের—আপনি সত্যি-কারের শিল্পী।'

'নমস্কার, মৃদুলা দেবী। তা হলে বলতে হবে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে এবং ধন্য হয়েছে বন্ধু ছোট সাহেবের অর্থ ব্যয়।'

'নিশ্চয়—এর জন্য আর বিশেষণ ব্যবহার করা নিষ্প্রয়োজন।'

ছোট সাহেব একটু গর্বাত্মক হাসি হাসেন।

প্রফেসার বলেন, 'মানুষের ক্ষণিক আনন্দের জন্য এমন ধারণাতীত পরিবেশ যিনি সৃষ্টি করতে পারেন রংগমঞ্চে তাঁর ভবিষ্যৎ সন্দেহাতীত উজ্জ্বল। ধন্যবাদ সৌম্যেনবাবু।'

পাহাড়ের মাঝামাঝি শ্রীরাধাকৃষ্ণের একখানা হোলি-উৎসবের প্রতিমূর্তি। যুগল মূর্তি বেষ্টন করে আছে শতেক গোপিনী। হোলির রঙে তাদের শ্রোণী জংঘা বক্ষাঞ্চল সিক্ত।

রায় সাহেব হরিশ্চন্দ্রের ছেলে একটু স্থূলকায়। তার ওপর এসব দেখে যখন চক্ষু বিস্ফারিত করল, তখন মৃদুলা একটু ভয় পেয়ে সরে এলো, 'ও মা!'

'আপনি ভয় পাবেন না মৃদুলাদিদি—সরি সরি—মৃদুলা দেবী—আমি একটু বিস্মিত হয়ে পড়েছিলাম।'

এই যদি বিস্ময় হয় তবে ভয়টা না জানি কি! এবার মৃদুলা মনে মনে না হেসে পারে না।

হিন্দুর হোলি-উৎসব। মহব্বৎ খাঁ জুতো খুলছিল। সৌম্যেন বলল যে এখন তার প্রয়োজন নেই। অগত্যা সে বাইরে দাঁড়িয়ে ষাঁড়ের মত মোটা ঘাড়টা দুয়ারের ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিয়ে একজন সমঝদারের কায়দায় হাসতে লাগল।

সৌম্যেন একটু মাথা নোয়াল।

সৌম্যেনের উপদেশ মত এবার সকলে সাহেবী ধড়াচূড়া ছেড়ে সুন্দর দেশি ধুতি ও পাঞ্জাবী পরতে বাধ্য হলো। আজ যা হবে তা একান্ত ভারতীয় পদ্ধতিতেই হওয়া বাঞ্ছনীয়।

একটু অসুবিধা হলো প্রফেসারের—কারণ বহিরাগত তিনি। একটু দায় ঠেকল রায় সাহেব হরিশ্চন্দ্রের ছেলে। পাঞ্জাবীটা মাপে

একটু খাটো, চওড়ায়ও একটু কম। তবু সৌম্যেন ছাড়ার পাত্র নয়। সে জোর করেই ঢুকিয়ে দিল তার গায়। সাহায্য করল একজন বেয়ারা।

ছোট সাহেব ওস্তাদ লোক। তিনি যতটা মোটা তার চেয়ে দেহটা অনেক সংকুচিত করে ডাইভিং প্রণালীতে পাঞ্জাবীর মধ্যে নিজকে প্রবিষ্ট করালেন। চমৎকার মানিয়েছে ছোট সাহেবকে।

মৃদুলা তো আগে থেকেই সেজেগুজে এসেছিল।

সৌম্যেনের কথা আর বলা বাহুল্য।

মহব্বৎ বার বার বলতে লাগল, 'বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা!'

সৌম্যেন অনেক বার ভদ্রতার খাতিরে মাথা নোয়াল, কিন্তু তবু মহব্বৎ থামে না।

শেষ পর্যন্ত সৌম্যেন বাধ্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'খাঁ সাহেব, বহুৎ আচ্ছা কেয়া চিজ্?'

মহব্বৎ আঙুল দিয়ে দেখাল—বহুৎ আচ্ছা পাহাড়ের মধ্যের ছোট ছোট গরুগুলি।

সৌম্যেনই প্রথম পদাবলী গেয়ে দিনের অনুষ্ঠান আরম্ভ করে। তারপর মৃদুলাকেও গাইতে হয়। ভার সাম্য না রেখে উপায়ও নেই—রেহাইও নেই।

প্রফেসার বললেন, 'বড় চমৎকার আজকার দিনটি।'

ইতিমধ্যে তাঁর কাপড়-চোপড় রাঙা হয়ে উঠল সৌম্যেনের পিচকারীতে। প্রফেসার প্রস্তুত থেকেও অপ্রস্তুতের ভান করলেন। 'হাঁ, হাঁ, হাঁ—একি!'

রায় সাহেব হরিশ্চন্দ্রের ছেলে স্নান করে উঠল রঙে জলে। সে একবার হড়কে গিয়ে কোন রকমে টাল সামলাল একটা দেয়াল ধরে।

মৃদুলা গম্ভীর হয়ে বসে দেখছে। সে বুঝতে পারল এবার তার পালা। জ্বালা বাড়ল তার। সে ছুটে চলল ও ঘরের দিকে। ছোট সাহেবও পিছন পিছন ছুটলেন। দেখতে দেখতে তার শাড়ি সেমিজ সায়া একাকার হয়ে গেল এক পিচকারীতে।

'রক্ষে করুন, রক্ষে করুন—আর নয়।'

কিন্তু কে তাকে রক্ষে করবে! ওদিকে তো সবাই মসগুল। ছোট সাহেব মৃদুলাকে জড়িয়ে ধরে একটা তীব্র চুমো খেলেন।

মৃদুলা আবীরের চেয়েও যেন রাঙা হয়ে উঠল। একটু যেন শ্লথ হয়েই গ্রহণ করল সে চুম্বন। কিন্তু বলে উঠল, 'এ আপনার নিতান্ত অন্যায়। আপনি মনিব—'

'আর তুমি ভৃত্য। যা মাইনে দেই তার মজুরী উসুল করে নিলাম। কিন্তু আজ আমাদের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধটা টেনে না আনলেই কি ভাল হয় না মৃদুলা?' ছোটসাহেব মৃদুলাকে বাহু বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন। 'আজ তোমাতে আমাতে সম্বন্ধ বন্ধু বান্ধবীর।'

'চলুন চলুন তাড়াতাড়ি—ওঁরা কি ভাবছেন।'

দুজনে যতটা দেরী করে সভায় ফেরে তা কারুরই প্রীতিপ্রদ হয় না। এদিকে সব যেন ঝিমিয়ে মিইয়ে গেছে। রং এবং আবীরের ভয়ে মহব্বৎ তার দাড়িতে হাত দিয়ে সামলে বসে আছে।

মৃদুলা গান আরম্ভ করল কিন্তু এবার আর তেমন গান জমল না। কারুর যেন কান সেদিকে নেই। কেমন অন্য-মনস্ক যেন সকলে। একটা প্রচ্ছন্ন হিংসায় অনুষ্ঠানের আনন্দটা যেন কেড়ে নিয়েছে।

ছোট সাহেব চা আনতে হুকুম করলেন।

আবার জমে উঠল সভা। রায় সাহেবের ছেলে একাই দু কাপ খেল। সে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। মহব্বৎ খাঁ বাইরে বসেছিল, ভিতরে আনা হলো তাকে টেনে।

নানা রকম পরামর্শ হলো। এবং সপ্তাহ মধ্যে একটা লিমিটেড কোম্পানী খোলা হবে তাও স্থির হলো। ছোট সাহেব জানালেন যে সন্ধ্যার পর দুজন মাড়োয়ারী বন্ধু আসবেন তাঁরাও কিছু শেয়ার কিনতে চান।

'এ তো ভাল কথা—লক্ষ্মীর বর পুত্র যাঁরা তাঁরা অংশীদার হওয়া তো সৌভাগ্যের বিষয়।' সৌম্যেন মন্তব্য ক'রে মৃদুলার অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করে। 'কি বলেন, মৃদুলা দেবী?'

'তা তো বটেই!'

সৌম্যেন ভাবে রাত্রি হবে—হক রাত। নিশুতি নীরব রাত্রি। চাঁদ উঠবে পূর্ণিমার। উঠুক ফাল্গুনের চাঁদ। দিগন্তপ্লাবী জ্যোৎস্না। সে মৃদুলাকে একাকিনী ডেকে নিয়ে যাবে—নিয়ে যাবে দীঘির ঘাটলায়। তারপর তাকে বলবে, 'আজ থেকে তুমি এবং আমি অংশীদার। সম্পূর্ণের একাংশ তুমি অপরাংশ আমি। এসো মিলিয়ে যাই এই মদির জ্যোৎস্নায়।'

চৌদ্দ

মন্মথও সংগে এসেছিল। কিন্তু সারা দিন সে বসে বসে বিরক্ত হয়ে গেল। আরও বিরক্ত হলো খাওয়া-দাওয়ার ম্লেচ্ছাচার দেখে। সে আর ড্রাইভার সীতারাম কিছু খেল না। সন্ধ্যার পর মন্মথ কিছু পয়সা দিয়ে সীতারামকে নিকটস্থ কোন দোকানে কিছু চিঁড়া মুড়ি আনতে পাঠিয়ে দিয়ে ঘাটলায় গিয়ে বসল। অল্প সময় পরেই সীতারাম ফিরে এলো। সে চিঁড়া মুড়ি আনেনি—এনেছে ছাতু।

'খাও বাবা পাঁড়েজি, তুমি একাই খাও, আমি বাঙালীর ছেলে বিশেষত বাঙাল, আমার ধাতে ওসব সইবে না।'

মন্মথ আর নিরম্বু উপবাস করল না—কারণ পুকুর বোঝাই তো জল রয়েছে।

'আচ্ছা ওরা এত রাত পর্যন্ত কি করছে? সারা দিন হৈ চৈ করল এখনও কি ওদের দম ফুরাল না? ব্যবসার পরামর্শ না ঘোড়ার ডিম! যত সব…'

'দম ফুরাবে? ঐ দেখো না ঘড়ির দম আরও বাড়ছে।'

একখানা মোটর এলো। দুজন কমসে কম আড়াই মণ আড়াই মণ পাঁচ মণ ওজনের পার্টনার নামলেন।

'এরা এখন এখানে এলো যে? আজ রাতটা তা হলে বুঝি এখানে বসেই মশার কামড় সইতে হবে। বাপরে যে মশা!'

পাঁড়েজিও বিচলিত হয়ে পাছায় চপটাঘাত করল। 'মশা নয় মন্মথ, ডাঁশ।'

ভিতরে যখন অফুরন্ত হোলি-উৎসব চলছে, বাইরে মন্মথ ও পাঁড়েজি তাড়িয়ে-দেওয়া কুকুরের মত এদিক ওদিক করে রাত কাটাতে লাগল।

সীতারাম বলিষ্ঠ যুবক, অনেকদিন ধরে বাংলা দেশে আছে। কিন্তু আজ তার মনটা চলে গেছিল দেহাতে। 'মন্মথ আজ আমাদের দেশেও এমনি আনন্দ। হোলির আবীরে লালে লাল গাছপালা, পথের মাটি পর্যন্ত।'

'তুমি সাদী করেছ?'

সাদী তার এবারই হতো—একটি মেয়েও ঠিক করেছিল তার বাপ, ঐ এক গ্রামে, কিন্তু ছুটির অভাবে তা হয় নি। এখন মনে পড়ছে সেই দেহাতি কন্যার মুখখানা। নথ-পরা একখানা গোল মুখ।

মন্মথ কিছু মন্তব্য করল না।

আবার গান আরম্ভ হয়েছে। সৌম্যেন একখানা গায়; তার পরই মৃদুলা।

প্রফেসার সময় বুঝে বোতলের ছিপি খুল্লেন। অতিথি যাঁরা এসেছেন সকলেই সানন্দে এক এক গ্লাস পান করলেন। কিন্তু মুস্কিল হলো মহব্বৎ খাঁর। সে থাকে ছোট একটা সহরে—সময়তে গ্রামে। বাপ ধর্মভীরু—নিজেও পাঁচ ওক্তো নমাজ পড়ে। এসব কাণ্ড দেখে সে আঁৎকে ওঠে। 'সরাব! বিস্‌মিল্লা, তোবা, তোবা!' বলে সে উঠে পড়তে চায়।

তিন চারজন গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সে বুনো ষাঁড়ের মত চোখ পাকিয়ে একবার ছোট সাহেবের দিকে তাকিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে পালায়। 'তোবা, তোবা, সরাব!'

কিছুক্ষণের জন্য গান থামে। একটু চিন্তিত দেখায় ছোট সাহেবকে।

মাড়োয়ারী বন্ধুরা উৎসাহ দেন। তখন প্রফেসার দ্বিগুণ উৎসাহে গ্লাসের পর গ্লাস ভরতে থাকেন। আবার হাসির হর্রা চলে। এবার হুকুম হয় নাচের।

মৃদুলা ক্লান্ত শরীর বলে আপত্তি জানায়। সৌম্যেন বলে, 'আজ থাক।'

সৌম্যেনের কথা কারুর ভাল লাগে না। কারণ মৃদুলার হয়ে তার ওকালতি করা একটা রহস্যজনক ব্যাপার। এখনই এই, এরপর তো আরও দিন পড়ে আছে। সকল মেয়েরাই নাচবার আগে ওরকম দর বাড়ায়।

সৌম্যেন মদ মাংস কিছুই ছোঁয় না। গরিব আর্টিষ্ট—বড়লোকের ভিড় থেকে ব্যথিত হৃদয়ে একপাশে সরে দাঁড়ায়।

এক রকম বাধ্য হয়েই মৃদুলাকে নাচতে হয়। এ পরিবেশ তার কাছে অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে। কিন্তু কতক মুক্তি পাওয়ার আশায়, কতক নিজের ভবিষ্যতের সুবিধার আশায়, সে অন্নের জন্য আর অসন্তুষ্ট করতে সাহস পায় না সম্মানিত ব্যক্তিদের।

একখানা নাচ নেচেই সে বিদায় নেবে।

সকলের ওপরই মদের পূর্ণ প্রভাব ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে।

মৃদুলা নাচছে। যখন সে নাচতেই সুরু করেছে, জীবনের শুভ ভবিষ্যতের পরীক্ষাই দিতে আরম্ভ করেছে, তখন কেমন করে সে তার সমস্ত জ্ঞান অনুভূতি ও সংজ্ঞা দিয়ে না নেচে পারবে? এক একটি মুদ্রা এক একটি কুসুম কোরকের মত তার হাত দিয়ে ফুটে

বের হতে থাকে। পায়ের চপল সঞ্চারণে, ঘাতে সংঘাতে বিধুর হয়ে ওঠে ঘরের বাতাস—হয়ত বাইরের জ্যোৎস্না। পৃথিবীর যত কামনা, লালসা, উন্মাদনা তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে যেন ওর ভঙ্গুর দেহখানায়।

সৌম্যেন মনে মনে তারিফ করে, কি অপূর্ব!

মাতালেরা হল্লা করতে থাকে।

চোখে জল আসে মৃদুলার। সে এত পরিশ্রম করছে কাদের জন্য?

সে থামবে—এমন সময় ছোট সাহেব এসে তাকে একখানা হালকা ছোট্ট লেপের মত তুলে নিয়ে যান। লজ্জার মাথা খেয়ে বাকি সবাই পিছে পিছে ছোটে। একটা ভীরু অনুনয়ের কণ্ঠ শোনা যায়। তারপর চীৎকার, তারপর সব স্তব্ধ।

মরল নাকি মৃদুলা? সৌম্যেন ছুটল। কিন্তু এগুতে পারল না, দুয়ার বন্ধ। সে দৌড়ে বাইরে গিয়ে মন্মথ এবং সীতারামকে ডেকে আনল। তারাই বা কি করবে? বন্ধ দুয়ার কি করে খুলবে? কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল সকলে। এখন কোনও সাড়া শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না।

সীতারাম বলল, 'বাবু চলে আসেন, মন্মথ চলে এসো—আবার হয়ত খুনের দায় পড়তে হবে আমাদের।'

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সৌম্যেন বুদ্ধি স্থির করে। সে একখানা গাড়ি নিয়ে থানার দিকে ষ্টার্ট দেয়।

থানা অফিসারেরা সব শুনে বলে, 'কিছু হয়নি—মিছামিছি আমাদের হায়রান করতে এসেছেন।'

'বলেন কি কিছু হয় নি!'

'ওরা সহজ জীব নয়—বিশেষত নাচওয়ালীরা।'

'কি যে বলেন, নাচওয়ালী—একটি ভদ্র মহিলা।'

'বাগান বাড়িতে কোন ভদ্র মহিলা আসে? আপনি দেখেছেন কখনও—না শুনেছেন কখনও? ভাল কাপড়-চোপড় পরলেই আর ভদ্র মহিলা হয় না।'

অন্য একজন প্রশ্ন করে, 'আপনার কে হয়?'

'আমার—'

'উনিও ঐ দলেরই—বোধ হয় পাত্তা পাননি। হবে আর কি? নাচওয়ালী, জোর বান্ধবী।'

'কি করব, ফার্ষ্ট ইনফরমেশন নেব?'

'তুমি ক্ষেপেছ! মিছামিছি একটা কেস বাড়িয়ে থানার রেকর্ড বাড়াতে চাও। একটা জেনারেল ডাইরী করে রাখো।'

'আপনারা কেউ কি যাবেন না?'

'দরকার হবে না।'

সৌম্যেন উঠে পড়ে।

'গেলে মন্দ হতো না সন্তোষ, যাও না বেশ সন্তুষ্ট হয়ে আসতে পারবে। অবস্থা মন্দ দেখছিনে—গাড়ি হাঁকিয়ে গেল। আসল ইনফরমেশনই এই সব, মুখস্থ করতে পারলেই দিন দিন কাজে উন্নতি হবে।'

'দাদা শিখিয়ে দিতে হয়—গুরুগিরি করা অত সোজা নয়।'

'তোমাদের মত নতুন নতুন যারা তাদের শুকনা প্রণামে পায় কড়া পড়ে যাওয়ার জোগাড় হ'ল—তুমি না হয় কিছু প্রণামী দিও।'

সৌম্যেনের সংগে সংগেই প্রায় পুলিশ এসে ওঠে।

'এলেন যে আবার ?'

'সে কৈফিয়ৎ নেওয়ার মালিক তো আপনি নন। এখন চলুন ঘটনাস্থলে।'

এবার আর ঘর খুলতে বেশি দেরী হয় না।

মৃদুলা ধূলিশয্যায় পড়ে, অজ্ঞান—। নাচের সজ্জা ছিন্ন ভিন্ন। এ কোঠাটা অনেকদিন পর্যন্ত পরিষ্কার করা হয় না, তাই একটা কেমন যেন দুর্গন্ধ আসছিল। মদের গন্ধ তো আছেই।

'উনি কতটুকু খেয়েছেন ?'

'মোটেই না।' সৌম্যেন বলে।

অতিথিদের মধ্যে বিদায় গ্রহণের একটা তাড়াহুড়া পড়ে যায়।

'আপনারা অনুগ্রহ করে কেউ যাবেন না।'

সকলের দৃষ্টি একটু ম্লান হয়ে আসে। রায় সাহেব হরিশ্চন্দ্রের ছেলে তো প্রায় কেঁদে ফেলার জোগাড়।

খুব তাড়াতাড়ি একটা প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। একজন ডাক্তার আসে। অল্প কিছু চেষ্টায় সংজ্ঞা ফিরে আসে মৃদুলার। সে সহজ মানুষের মত উঠে বসতে চায়, কিন্তু তা পারে না। তার উরু জঙ্ঘা বুক পিঠ পাঁজর—বলতে গেলে সারা দেহ যেন বিষে ছেয়ে গেছে।

মৃদুলা একটু সুস্থ হলে তাকে জেরা করা হয়।

'সৌম্যেন বাবু থানায় ইনফরমেশন দিয়েছেন যে আপনার ওপর নাকি কে কে অত্যাচার করেছে—একথা কি সত্য ?'

মৃদুলা ধীরে ধীরে 'কি জানি' বলে।

'বুঝলাম, একটু জোরে বলুন কে কে দোষী।'

'কেউ দোষী নয়।'

সৌম্যেন উত্তেজিত হয়ে বলে, 'একি বলছ মৃদুলা !'

'তবে এঁরা যা করেছেন, তা আপনার স্ব ইচ্ছায়ই করা হয়েছে ?'

মৃদুলা ক্লান্তি ও ঘৃণায় চুপ করে থাকে। এ কি অভদ্র জেরা !

'মানুষ কি এমনি এমনি অজ্ঞান হয় ? থাক, আপনারা যেতে পারেন। সৌম্যেন বাবু, এঁকে আপনি নিয়ে যান। আমরা তো আগেই বলেছিলাম। বাঙালী মেয়েরা অত্যাচার সইতে পারে —কিন্তু আইনের আশ্রয় নিতে পারে না। শুধু শুধু আমাদের যত বদনাম।'

পনের

আবার মন্মথর বুকের ভিতর জংলা ঘোড়া ছুটতে থাকে। অনেক দিন পরে সে আবার ঠিক করে কংগ্রেস আফিসে যাবে। যাবে সমস্ত দুঃখ দুর্দশা ও গ্লানির মূলোৎপাটন করতে। সে যেকদিন বেঁচে আছে মানুষের কল্যাণে বিশেষতঃ গরীব দুঃখীর কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেবে। পথ সে চেনে না, সেই পথের সন্ধানেই সে যাত্রা করে। যাওয়ার আগে সে যতীনকে জিজ্ঞাসা করে, 'যতীন, চাকরী ছাড়ব নাকি? এ গোলামী আর সহ্য হয় না। কখনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারব না—কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাওয়া!'

'ঠায় মরে যাবে, চাকরী বজায় রেখে কাজ করো—নইলে তোমার সেবা সফল হবে না।'

মন্মথ পথে বেরিয়ে নিজেকে প্রশ্ন করে, সেখানে গিয়ে কি বলবে? যতীনের কাছে তো জিজ্ঞাসা করে আসা হলো না।

কয়েকটা সোজা বাঁকা রাস্তা ঘুরে মন্মথ এসে একটা দোতলা দালানে উঠল। একখানা বড় প্রকোষ্ঠে ধবধবে চাদর পাতা মস্ত চৌকি। তার ওপর গোটা কয়েক তাকিয়া। কয়েকটা আলমারী চেয়ার টেবিল হোয়াট্-নট্, কয়েকজন ভদ্রলোক বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন।

মন্মথ গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

'কাকে খুঁজছ?'

'এক বাবুকে।'

'নাম?'

'মন্মথ দে।'

'বাড়ি?'

'বরিশাল।'

'ওঃ!' এমন ভাবে ভদ্রলোক মন্তব্য করেন যে বাঙাল বলে আর শ্লেষ করার দরকার হয় না।

'কাকে চাও তার নাম বলো, তোমার পরিচয় তো পেলাম।'

'সেই বাবুকে যাকে চাঁদা দিয়ে গেছি।'

'চাঁদা তো বাবুকে দাওনি, দিয়েছ কংগ্রেসকে। এখন ফিরিয়ে নিতে এসেছ নাকি?'

'না না, বাবু—আমি সেরকম লোক নয়।'

অন্য এক ভদ্রলোক বলেন, 'তুমি মাত্রা জ্ঞান হারাচ্ছ দ্বিজেন, চুপ করো আমি জিজ্ঞাসা করি। বাবু দেখতে কেমন?'

এমন সময় রমানাথ প্রবেশ করেন। খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী পরলেও তাঁকে বেশ অবস্থাপন্ন বলে মনে হয়।

'এই যে বাবু।'

'কি চাও?'

'একটা কথা বলব।' কিন্তু কিছু বলার আগে মন্মথ রীতিমত ঘেমে ওঠে।

'বলো বলো কি বলবে—আমি আবার মিটিংয়ে যাব।'

'এখন আপনি ব্যস্ত, তবে আর এক সময় আমি আসব।'

'আচ্ছা, তাই এসো।'

রমানাথের চেয়েও ব্যস্ত ভাবে মন্মথ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। রাস্তায় এসে একটা হাঁফ ছাড়ে। কিন্তু একটু বাদে আবার মনটা কেমন কেমন করতে থাকে। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে— এ দুর্বলতা সে আগামী কাল ত্যাগ করেই আসবে। তার এতটা লজ্জিত হওয়ার কি হেতু আছে? ওঁরাও সব মানুষ, আর সেও মানুষ।

পরদিন ঠিক মন্মথ আসতে পারে না। কেমন যেন লজ্জা ভয় ও সংকোচে আড়ষ্ট হয়ে থাকে। আসে তার পরের দিন। নিজেকে বড় বেমানান ঠেকে। সকলেই কেমন সুসজ্জিত, শিক্ষিত আর ও যেন তাদের তুলনায় নিতান্ত অশোভন। ওর জুতা নেই, তেমন একটা জামা নেই, না আছে এক জোড়া চশমা। সামান্য খবরের কাগজখানাও তো পড়তে জানে না মন্মথ।

'বসো, বসো এইখানে।' রমানাথ তাকে নিজের কাছেই বসতে ইংগিত করেন।

কিন্তু মন্মথ কুণ্ঠায় এতটুকু হয়ে যায়। সে কি চেয়ারে বসার উপযুক্ত—বলেন কি বাবু!

'এখন বলো কি জন্য এসেছ?'

মন্মথ আমতা আমতা করে। একঘর লোক তার কথা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। সে আজ দ্বিগুণ ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে।

রমানাথ মন্মথর অবস্থা দেখে তাকে নিয়ে অন্য একটা কোঠায় চলে যান। যত্ন করে নিজের কাছে বসান। কিন্তু মন্মথ সরে বসে অনেকখানি ব্যবধান রেখে।

'বাবু—'

'চুপ করলে যে, বলো কি বলবে ?'

'আমি বড় দুঃখী।'

'এখান থেকে তো আমরা কিছু সাহায্য করতে পারব না। তবে যদি কন্যাদায়-টায় হয় আমি একটা লিষ্টি করে দিচ্ছি, সেই সব বাড়িতে যাও। তাঁরা নিশ্চয়ই তোমাকে—'

'না বাবু, তা নয়।'

'তবে ?'

'আমি একটু দেশের কাজ করতে চাই। এত দুঃখ আর সহ্য হয় না বাবু।' মনে পড়ে তার আব্বাস, মৃদুলা, মল্লিকা ও সন্ধ্যার কথা। মনে পড়ে তাদের বস্তির ঘোর দৈন্য—নিদারুণ অসামঞ্জস্য। মন্মথ বেশি কিছু বলতে পারে না। বোবা মানুষের মত আবেগে তার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসে।

রমানাথ সব বুঝতে পারেন। এই অশিক্ষিত বাঙালটার প্রাণে যে কি আলোড়ন হচ্ছে তার তুলনা হয় না।

'তুমি কি পর্যন্ত পড়েছ ?'

'শুধু নাম লিখতে পারি।'

'করো কি ?'

'এখানে এক কারখানায় হেড মিস্ত্রী আমি।'

'তাই তো, তোমাকে আমি কি কাজ দেব—ভাবনার কথা বড়।'

'বাবু কোনও ভাবনা নেই, আমি সব কাজ জানি। যা দেবেন তাই করতে পারব—শুধু লেখাপড়া ছাড়া।'

রমানাথ সমস্যায় পড়েন।

'বাবু কংগ্রেস নাকি দেশ স্বাধীন করবে, আর স্বাধীনতা এলেই নাকি একেবারে দেশের ভোল বদলে যাবে—দুঃখী মানুষ আর থাকবে না। আমি আপনার কাছে শপথ করে বলছি সেই কংগ্রেসের জন্য দরকার হলে আমি জীবন পর্যন্ত দেব। আজ থেকে আমার ধর্মকর্ম দেবসেবা ঐ কংগ্রেস।' মন্মথ কাপড়ের খুঁট খুলে বহুদিনের কষ্টার্জিত পাঁচটি টাকা রমানাথের সুমুখে রাখে।

'ও কি?'

'বছর চার আনা চাঁদা দিই, তাতে হয় কি বাবু—এই পাঁচ টাকা আমার নামে জমা করে নিন। আমি এখন আর পারছি নে, পরে আরো দেব। আমরা নিতান্ত গরীব কিনা। আপনার হাত দুখানা ধরছি, ওঁদের কারুকে কিছু বলবেন না।'

বহুদিন ধরে এই অঞ্চলের কংগ্রেস-সেক্রেটারী রমানাথ। তিনি জীবনে এমন আর একটি লোক কখনও দেখেন নাই। মন্মথর দেওয়া টাকা নিতে তাঁর মন সরে না, ফিরিয়ে দিতেও সাহস হয় না।

'বাবু ভাবছেন? আমি চোর ডাকু নই—আমার দেশে কিংবা কারখানায় কোনও বদনাম নেই। আমাকে উপেক্ষা করবেন না।'

'তোমার টাকা আমার কাছেই গচ্ছিত রইল। কাল এসো—কাল কেন রোজ এসো, তোমাকে আমি কাজ দেব।'

মন্মথ সন্তুষ্ট হয়ে চলে যায়।

রমানাথ চিন্তিত মনে পূর্বের স্থানে ফিরে আসেন। মন্মথর অনুরোধ ভুলে সকলের কাছে তার কথা খুলে বলেন। যাঁরা ভেবেছিলেন একটু হাসবেন, ঠাট্টা তামাসা করবেন রমানাথের নতুন বন্ধুটিকে নিয়ে, তাঁরাও গম্ভীর মনে চিন্তা করতে থাকেন।

'আমাদের এমন কোন কাজের জোগাড় নেই যে এমনি সাধারণ মানুষকে খাটিয়ে নিতে পারি। আর বলতে গেলে কাজ তো আমাদের নেই—শুধু একটু লেকচার, সময়েতে রিলিফের নামে হৈচৈ। এত সহজে দেশ উদ্ধার হয় না।' রমানাথের মুখ দিয়ে আরও এমন অনেক কথা বের হয়, যা একজন কংগ্রেস সেক্রেটারীর পক্ষে সত্যই লজ্জাকর। 'এখনও আমরা জনসাধারণ থেকে কত দূরে—এ ব্যবধান কবে ঘুচবে বলতে পারো, দ্বিজেন ?'

'রমানাথ চঞ্চল হয়ো না। রাজনীতিতে সেন্টিমেন্টের প্রশ্রয় দিলে চলে না।'

'আমাকে আর বোঝাতে হবে না। সব বৃহৎ কাজের পিছনেই একটা সেন্টিমেন্ট আছে। তবে সেটাকে অতিরিক্ত বাড়তে দেওয়া ভাল নয়। যাক, সে সব তর্কে এখন প্রয়োজন নেই। কাল লোকটা আসবে—ওকে কি করে জড়িয়ে রাখবে তাই এখন স্থির করো।'

কিন্তু কিছুই স্থির হয় না।

পরের দিন মন্মথ এসে রমানাথকে প্রণাম করে।

'বসো।' চেয়ার দেখিয়ে দেন রমানাথ।

'তা হচ্ছে না বাবু—ও আমি পারব না কখনও আপনাদের সামনে। আপনাদের তুলনায় আমি হচ্ছি গোষ্পদ।'

সকলে ওকে ডেকে চৌকির এক পাশে বসতে বলেন। মন্মথ এ আপ্যায়নে যেমন সৌভাগ্য তেমনি আনন্দ বোধ করে। কেমন উদার ব্যবহার। এ যেন ভিন্ন জগৎ, ভিন্ন পরিবেশ। এখানে ছোট বড়, উঁচু নিচু সব সমান।

'মন্মথ ভাই, তুমি ঐ কাগজ পত্রগুলো আনতো। আজ থেকে তোমার ওপর আমি এমন কাজের ভার দেব যা এই আফিসের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। ঐ ফাইলগুলো—।'

রমানাথ যেমন গম্ভীর হয়ে বলেন মন্মথ তেমনি মনোযোগ দিয়ে শোনে।

অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করে থাকেন অন্যান্য সকলে।

'বড্ড ধুলো জমে গেছে বাবু। কদ্দিন যেন ঝাড়া পোঁছা হয়নি।'

'এখন আমাকে কাজের কাগজগুলো দাও—একটু ভাল করে ঝেড়েঝুড়ে নিয়ে এসো।'

মন্মথ ফাইলগুলো অতি সন্তর্পণে ঝাড়ে। তবু সবাই নাকে কাপড় দেন।

দিনের পর দিন মন্মথ কাগজ পত্র ঝাড়তে ঝাড়তে টেবিল আলমারীও পরিষ্কার করে—বিছানা পত্র ঘর দোর কিছুই সে আর অন্যের জন্য বাদ দেয় না। ঘর দুয়ার আলমারী ডেস্কের চাবি তালাও তার জিম্মা হয়ে যায়। দূর দেশ থেকে কেউ এলে তার যত্নের ভারও পড়ে মন্মথর ওপর। কখন পান তামাকের ফরমাস হলে মন্মথকেই দোকানে যেতে হয়। সময়তে জুতা জামাও এগিয়ে দিতে হয়। ক্রমে ক্রমে সে অপরিহার্য হয়ে ওঠে এই শাখা আফিসটিতে।

মন্মথ সকাল বিকালে এখানে ডিউটি দেয়—দুপুরটা কাটায় কারখানায়। এত পরিশ্রমেও মন্মথর শরীর ভাঙে না—শুধু একটা কালো ছোপ পড়ে সারা মুখে।

'তোমার টাকা পাঁচটা জমা করে দিয়েছি পুর্ব বাঙলার রিলিফ ফণ্ডে।'

'বেশ করেছেন বাবু, বেশ করেছেন।' তারপর মন্মথ বলে, 'আপনারা তো বন্যা দেখেননি আমাদের দেশের—আমি স্বচক্ষে দেখেছি।' সে বন্যার একটা প্রলয়ংকরী মূর্তি এঁকে দেয় সকলের মনে।

যেন একটা বন্যার ঝাপটা এসে লাগছে সকলের মুখে চোখে। ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গরু-বাছুর। কাঁদছে ককাচ্ছে শত সহস্র কৃষাণ কৃষাণী। হঠাৎ তার মনে পড়ে নবীনের বৌর কথা। আর তার পঙ্গপালগুলোর অসহায় অবস্থা। নবীনের স্ত্রী ভাল আছে তো? তাদের দেশেই না এই বন্যা? এই প্রলয়ংকরী ধ্বংস লীলা? উল্টে গেছে চালা, উপড়ে গেছে বট-বাবলা-অশ্বত্থ-পাকুড়। ভেঙে ভেসে চলেছে ছোনের আর খড়ের ছাউনী। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মানুষ হাহাকার করছে, জল থামছে না।

নবীনের বৌর চোখের জল নাকি!

'কি মন্মথ, হঠাৎ থামলে যে?'

'এমনি।'

কিছুক্ষণ বাদে মন্মথ জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা দ্বিজেন বাবু, এর কি কোন প্রতিকার নেই?'

'থাকবে না কেন, এই যে হাজার হাজার দয়ালু লোকে চাঁদা দিচ্ছেন, আমরা প্রাণান্ত খাটছি।'

'ছোটকাল থেকে দেখে এলাম ভিক্ষায় কারুর পেট ভরে না—দুঃখও ঘোচে না। চাঁদাটা তো এক প্রকার ভিক্ষারই শামিল, কি বলেন?'

'ভিক্ষা দেয় মানুষে দু চার পয়সা—কিন্তু এ যে হাজার হাজার টাকা, মহৎ প্রাণের দান!'

'প্রার্থীও যে লক্ষ লক্ষ।'

রমানাথ বলেন, 'দ্বিজেন ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারছে না, মন্মথ। যদি দেশ স্বাধীন হয়, এবং তা অদূর ভবিষ্যতে হবেই—তখন গভর্ণমেন্ট এমন সব বাঁধ বাঁধবে—এমন সব নদীর গতি পরিবর্তন করে দেবে যে আর শত বৃষ্টি হলেও এক জায়গায় জল জমে বন্যা হবে না। কৃষি-প্রধান দেশের কৃষককেই তারা আগে রিলিফ দেবে।'

'এ বরঞ্চ সম্ভব।'

বাড়ি ফেরার পথে মন্মথ ভাবে: ওর দেওয়া টাকা কয়টা হয়ত পৌছে যাবে নবীনের বৌর হাতে। অসময়টা তো সামলে নেবে। ও আরও দেবে, প্রতিমাসে পাঠাবে। দরকার হলে নিজে যাবে। যতদিন না স্বাধীনতা আসে ততদিন ও কংগ্রেসের হয়ে প্রাণপণে খাটবে। আবার শপথ করে মন্মথ নীরবে।

যে দিনই আলাপ আলোচনা একটু বেশি হয় সেদিনই মন্মথর বাড়ি ফিরতে রাত হয়। কত আশা আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে যে সে পথ চলে! বাসায় ফিরে সৌদামিনীকে সব বলে। কিন্তু সৌদামিনীর এখন স্থান সংকুলান হয়েছে। সে দু একটা হুঁ হাঁ করে ঘুমিয়ে পড়ে। মন্মথ একটু ব্যথা পায়।

এক একদিন যতীন টিপ্পনী কাটে। 'ঘাস দেখিয়ে দিয়েছি বলে তো তোমাকে ঘোড়ার মত খেতে বলিনি। তুমি মানুষ, একটু কম কম খেও—হজম হওয়া চাই তো।'

'ঠাট্টা করছ যতীন? ঘাস নয়, মধুর সন্ধান দিয়েছ তুমি।'

'তোমার কথা সত্য হলে তাতেও আমার বদনাম হতে পারে। মধুর নেশাও গুরুতর।'

মন্মথ একটু হাসে।



যতীন আবার একদিন উত্তেজিত করে মন্মথকে।

'যাও না দাদা দেশে—যাও না একবার।'

'কেন?'

'একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোল। লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করো ইস্কুলের ছেলে-ছোকরাদের মারফতে—দেশের রমজান আব্বাস যদু ধোপাকে। ওরাই তো দেশের প্রাণ। কি বলেন, একবার জিজ্ঞাসা করে উপদেশ নাও না ওঁদের কাছ থেকে।'

কথাটা ভালই। একবাক্যে উৎসাহ দেন সকলে। রমানাথ বলেন, 'এই তো আসল জায়গায় হাত দিয়েছ, মন্মথ। এর চেয়ে গঠন ও সংস্কার মূলক কোন কাজ নেই কংগ্রেসের।'

'আমি ছুটির দরখাস্ত করেছি।'

'ভাল করেছ।'

'যাওয়ার সময় কতগুলো প্যাম্পলেট পোষ্টার নিয়ে যেও।'

'যাব, সবই করব, কিন্তু আমি তো একেবারেই কিছু জানিনে। যদি আপনি একবার যেতেন। আমার বাড়ি-ঘর আছে, কোন কষ্ট হবে না।'

'তা হয় না মন্মথ—আমরা কি সব জয়াগায় যেতে পারি? কত কাজ আমাদের!'

'তবু—'

'ও সব স্থানীয় কর্মীরাই করবে, এই তোমার মত যারা মহৎ প্রাণ। পাড়াগাঁয়ের জলবায়ু কেন যেন আমার সহ্য হয় না একটুতেই পেটটা খারাপ হয়—স্বাস্থ্য টিকতে চায় না মোটে।'

কেউ না যাক—মন্মথ একাই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়।

সে বাসায় ফিরে যতীনকে ডাকে। 'শুনেছ যতীন ?'

যতীন রক্তবর্ণ চোখ দুটো মন্মথর দিকে মেলে ধরে জিজ্ঞাসা করে, 'কি ?'

'সাম্যবাদ, সাম্যবাদ নাকি হবে দেশে—হবে কৃষাণ-মজদুর-রাজ।'

'অর্থাৎ ?'

'এই মোটা কথাটাই জান না ? সব এক হয়ে যাবে, সব এক—'

বোতল একটা হাতেই ছিল যতীনের। সে এক ঢোক খেয়ে হাসতে লাগল। 'তোমার বৌ আমার হবে, আর আমার বৌ তোমার ? কোন ভেদাভেদ থাকবে না এই তো ?'

'তুমি এখন নেশায় চুর, তোমার মাথার ঠিক নেই—নইলে এত বড় কথাটা নিয়ে কি অমন জঘন্য ঠাট্টা করতে সাহস পেতে ?'

'আমাদের বস্তির যত আইবুড়ো ছোকরারা, ওপারের দালানের যত আইবুড়ি ছুকরীদের কাছে অনায়াসে যেতে পারবে, পুলিশে ধরবে না ?'

'থামো, থামো,—ঘরে যাও। কি যে সব বাজে কথা বলো !'

'এ না হলে আর সাম্যবাদ হলো কি মন্মথদা ?'

'সাধে বলে মাতাল !' মন্মথ রাগে গড়গড় করতে থাকে।

'ছটা রিপুর মধ্যে কামের জ্বালাই যে বড় জ্বালা ! ঐটাতে সাম্যবাদ না এলে—'

'তুমি শুধু মাতাল নও—কুকুর হয়েছ। তাই আজ অমন করছ। আমি চললাম।'

যতীন হাসতে হাসতে বলে, 'জ্ঞান হয়েছে অবধি বোধ হয় তোমার একটি রাতও কুণ্ডলী দেওয়া বাদ যায়নি। শূন্য বিছানায় রাতের পর রাত শুয়ে দেখেছ? মানুষ পাগল হয়ে যায়—মদ খায়, যা তা করে। ভাত তো মানুষে যেমন তেমন করে খাবেই, কিন্তু তারপর চাই রাত কাটাবার সুন্দর ব্যবস্থা—ঐ বাবুদের মত। নইলে তোমার সাম্যবাদ নিয়ে তুমি থাক।'

মন্মথ ঘরে ঢোকে। যতীন বাইরেই বসে থাকে। রাস্তার গ্যাসের ক্ষীণ একটা আলো এসে পড়েছে যতীনের মুখে। ওকে ঠিক মাতাল বলে যেন মনে হয় না। 'ভুগে দেখনি মন্মথদা—শুধু ভোগ করেই এসেছ এতদিন।'

ভিতরে বসে সবই শোনে মন্মথ কিন্তু বিরক্তি ঘৃণায় উত্তর দিতে পারে না।

হঠাৎ যতীনটা কাঁদতে থাকে।

মন্মথর নরম প্রাণ কেমন করে ওঠে যেন। 'আবার কি হলো তোমার? যাও, ঘরে গিয়ে শোও।' সে বেরিয়ে এসে হাত ধরে টেনে তোলে যতীনকে।

'মন্মথদা, ভেবে দেখ প্রতি ঘরে প্রতি প্রাণে এই অভিযোগ ধক্ ধক্ করে জ্বলছে কিনা?'

'সব অভিযোগ তো আর মিটান যায় না।'

'তবে সাম্যবাদ কিসের? সে সাম্যবাদের কথা তোমার যতীন শুনতে চায় না।' যতীন ওঠে। 'একটু মদ খেয়ে দেখো, মাথা পরিষ্কার হবে—তখন সব বুঝতে পারবে।'

গভীর রাত্রে মন্মথ ভেবে দেখে—সহসা ঘুমটা ভেঙে যায়। সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। 'যতীন, যতীন!'

'কি মন্মথদা ?'

'ঘুম আসছে না।'

'একটু ওষুধ খাবে, আমার হাতেই আছে।'

'না। তুমি শোন, একটু মন দিয়ে শুনো। একজন কে যেন এসেছেন, বলছিলেন, ক্ষুধার জন্য সাম্যবাদ। আমি বলছি পেটের ক্ষুধা, তুমি বলছ দেহের—সব ক্ষুধাই তো মিটান মানুষের ধর্ম। তাই তো আমি মেয়ের বিয়ে দিয়েছি—এ তো সামাজিক ব্যবস্থা ! যতীন, তুমি রাগ করেছ আমার ওপর ?'

'না।'

'এ তো সহজ চিকিৎসা।' মন্মথর হৃদয়ে একটা আনন্দ হয়। 'শুধু শুধু এতক্ষণ মাথা ঘামালাম—রাগারাগি করলাম—আমরা পাগল যতীন, আমরা সব পাগল।'

এমন ভাবেই মন্মথ এ সব বলে যে সে যেন হঠাৎ জ্ঞানী হয়ে উঠেছে। রাত্রির অন্ধকারে তার অনুভূতির সমস্ত দুয়ার গুলো খুলে গেছে।

'আজ বুঝি তোমাদের মনোহারী দোকানে এই সব পাইকারী আলোচনা হয়েছে ? তা যা হক তাতে আমার দরকার নেই।'

'কি যে বলো যতীন ! একটু ভক্তি শ্রদ্ধা করতে শেখো। একদিন তুমিই তো আমাকে পাঠিয়েছিলে ওখানে, আজ বলছ যা তা।'

'মাতালের কথায় রাগ করো কেন মন্মথদা, আমি সব সময় কি সব বুঝে বলি ! যাকে সহজ বললে, সামাজিক ব্যবস্থা বললে—তা এখন আর অত সহজও নয়, আমাদের হাতেও নেই। নইলে একই রাস্তার এপাশে বস্তি ওপাশে দালান উঠতে পারে ?'

মন্মথ ঠিকঠাক সমস্ত বুঝতে পারে না। সে হাঁ করে থাকে।

'বুড়ো সমাজ এখন আর আমাদের চায় না—যোয়ান সমাজ গড়তে হবে। মনোহারী দোকানে যাও—যাও, এই হলুদ গুঁড়োর কথা কখনো ভুলো না। তা হলে বারোয়ারি নেমন্তন্ন কিছুতেই রাঁধতে পারবে না।'

আজ অনেক কথাই উঠেছিল কংগ্রেস অফিসে। তার মধ্যে সাম্যবাদের কথাটাই প্রাধান্য লাভ করেছিল। আমাদের বোকা মন্মথ বুঝেছিল শুধু পেটের ক্ষুধার জন্যই সাম্যবাদ, কিন্তু যতীন আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে তার বীজ বপনের ইংগিত দিয়েছিল। এ যে অমৃত ফলের চাষ। আর এত কথাও জানে ঐ মাতালটা!

তার ইচ্ছা করে একবার মল্লিকাকে গিয়ে বলে, মৃদুলাকে জানিয়ে আসে—খুঁজে বার করে সন্ধ্যাকে। তার সকল দুঃখী দিদিদের দুয়ারে দুয়ারে এই আশার বর্তিকা নিয়ে ছুটে যায়। —দূর করে দিয়ে আসে যত মর্মান্তিক তমিস্রা।

ষোল

সময় মত মন্মথ তার দেশের মাটিতে এসে পা দেয়। আঃ! তার প্রাণ জুড়িয়ে গেল, জুড়িয়ে গেল সারা দেহ। কি শান্তি চরের নরম মাটিতে। সারা দেহে এসে নদীর জলের ভিজে হাওয়া লাগছে। কত বড় দিগন্ত-প্রসারী নদী। কতদিন এ দৃশ্য সে দেখে নি। সে ইচ্ছা ক'রেই নদীর চরে নেমে, নদীর দিকে চেয়ে চেয়ে খানিক হাঁটল। যে পা দুখানা ওর কলকাতায় পিচের পথে হেঁটে হেঁটে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে তার জ্বালা নিমেষেই যেন নিরাময় হয়ে গেল। ছিল গ্রাম্য পাখি, কে যেন শিকল দিয়ে রেখেছিল পায়। ও শিকল কেটেছে—গ্রামের পাখি গ্রামে ফিরে এসেছে।

মন্মথ নৌকা একখানা কেরায়া করে চড়ে বসল। নৌকা চলল জোয়ারের জলে তরতরিয়ে। দুপাশের শ্যামশোভা, কেমন মনভোলা ঠেকছে।

মাঝি বলল, 'আমি একটা কথা কইতাম।'

'বলো না কি বলবে? তোমরা ভাই বেশ সুখে আছ। শাক অন্ন খেয়েও যদি দেশে থাকতে পারতাম! আমাদের দেশের মত কি এমন দেশ দুনিয়ায় আছে। কত জল, কত হাওয়া। কেমন স্নিগ্ধ শ্রী। বড় দুঃখে আছি কলকাতায়।' মন্মথর মনে পড়ে যত অসামঞ্জস্যের কথা। আর মনে পড়ে আলো বাতাসহীন পংকিল বস্তির কর্দমাক্ত জীবন-যাত্রা। এমন ভাবে সে জড়িয়ে পড়েছে, আর হয়ত দেশে ফিরে আসতে পারবে না তার জীবনে। ছিল স্বাধীন মানুষ, এখন হয়েছে হুকুমের দাস।

'দুঃখডা কি আপনার—চাকরি বাকরি নাই নাকি ?'

'চাকরি থাকাই যেন বড় কথা—এমন গোলামীর রংমশালও জ্বালিয়ে দিয়েছে ইংরাজ ! তোমরা বুঝবে না, একেবারে ক্রীতদাস করে রেখেছে আমাদের।' মন্মথ আজকাল কিছু কিছু বিশ্লেষণ করতে শিখেছে। শিখেছে বড় বড় কথা বলতে। 'চাকরি আছে, মাইনেও পাই প্রায় শখানেক।'

'তয় যে কইলেন, বড় দুঃখে আছেন ? ছোবান আল্লা, মাসে একশো, বছরে বারশো। এত টাকা দিয়া করেন কি ?'

'তুমি বুঝবে না। এখন যা বলবে বলছিলে তাই বলো।'

'আমি একজন লোক লমু ? পয়সা চাইর আনা দেবে, যাবে আপনাগো গেরামে।'

'নাও, ডাকো তাকে—তবু যাব কথাবার্তা বলতে বলতে।'

'আপনে বড় চাকুরিয়া—দিলডাও খোদায় দেছে বড়।'

একটি ছেলে এসে নৌকায় ওঠে। পায়ের কাদা ধুয়ে মন্মথর কাছে গিয়ে বসে।

'তোমার নাম ?'

ছেলেটি মন্মথর দিকে একটু চেয়ে থেকে, তার পায়ের ধুলো নেয়। 'আমি রতন কর্মকারের ছেলে—নাম অবনী। এইবার ম্যাট্রিক দিয়েছি।'

'তাই নাকি ? তোমাকে তো চিনতেই পারিনি। কতদিন আমি দেশ ছাড়া !'

'আমি আপনাকে দেখেই চিনেছি। ছোট বেলায় বাবার সংগে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন খাজনা দিতে আপনাদের বাড়ি গেছি। আপনারা আমাদের কাছে চার আনা খাজনা পান। চার আনার

অনেক বেশি পান বাতাসা নিয়ে বাড়ি এসেছি। ঐ মিষ্টির লোভেই তো আমি বেড়াতে যেতাম।'

'ভালই হল তোমার সংগে দেখা হয়ে। খালের এপার ওপার আমাদের বাড়ি, ভালই হলো।' তারপর মন্মথ অবনীকে সকল কথা খুলে বলে। 'একটি কংগ্রেস অফিস করতে চাই। এই দেখ প্যাম্পলেট, পোষ্টার এনেছি—যা যা দরকার সবই এনেছি।'

'কিন্তু দেশে একটা দলাদলির আশংকা করি—পুলিশের ভয় তো আছেই।'

'আমরা তো কোন বেআইনি কাজ করব না। প্রথম একটা নৈশ বিদ্যালয়—তারপর লাইব্রেরি আর দৈনিক কাগজ একটা। এর মধ্যে পুলিশ আর দলাদলির কি আছে? আর থাকেই যদি তোমাকে কি পাব না? তুমি কি জুলুমবাজীর পিছনে শক্ত হয়ে আমার সংগে দাঁড়াবে না? পাঁচটা গাঁয়ের ভিতর তুমিই শুধু একটি পাশ-করা ছেলে।'

'পাশ করিনি, করব। আমাকে পাবেনই।'

'পাঠশালার পণ্ডিতকে?'

'তাঁকেও পাবেন।'

'কিছু টাকা পয়সার দরকার।'

'আমাদের পাড়ার রমেশ খুড়োকে ধরুন—বুড়োর পয়সা খাবে কে? জীবন ভরে তো চুরি ডাকাতির মাল গালিয়েছে—এখন একটু সৎকাজে ব্যয় করুক।'

'মানুষের ওপর শুধু শুধু বদ ধারণা করো না। সারা জীবন খেটে খুটেও তো কামাই করতে পারে।'

'আপনি ওকে চেনেন না।'

'এইখানে এট্টু থামাই নাও, বড় রদ্দুর। এট্টু তামাক খামু।' মাঝি জিজ্ঞাসা করে, 'ওখান কিসের ছবি? ঐ যে মাইয়া লোকটির হাত পা বাইন্ধা চাবুক মারতে আছে দুই সাহেব? অমন খাপসুরৎ, চোরণী নাকি? না বিষ খাওয়াইছে স্বোয়ামীরে?' নৌকাটা একটা পত্রবহুল গাছের নীচে ভিড়িয়ে মাঝি ফের বলতে থাকে, 'শোনেন তয়, আমাগো গ্রাশেও খুব সুন্দরী এট্টি বৌ আছে—আশু শীলের বৌ। সেও তার স্বোয়ামীরে—'

'কি যে বলছ তুমি। ও-তো বন্দিনী ভারত-মাতার ছবি।'

'ভারত-মাতা কেডা?'

এ জবাব দেওয়া মন্মথর পক্ষে মুস্কিল। এমন যে পঞ্চ গ্রামের রত্ন অবনী সেও সহজ কিছু ব্যাখ্যা স্থির করতে পারে না।

অবশেষে মাঝিই নিজের প্রশ্নের নিজে মীমাংসা করে। 'আপনারা কইছেন ভারইতার মার কথা? সে তো চোর-চোট্টা না, ভাল মানুষের ঝি,—তারে মারবে ক্যান সাহেবরা? আর অমন নবীনাও না সে, ও আমাগো গ্রাশের আশুর বৌর তসবির—সেই রকমই লাগে যে। এই গ্রাখেন গালে টোল—দুষ্ট মাগীগো নিশানা।'

এতক্ষণ মন্মথ ও ছেলেটি হাসছিল চোখ টিপে টিপে। এবার বড় আঘাত পেল মন্মথ। সে সারা নদীপথ ধরে ওকে একটু একটু করে বোঝাতে লাগল সব। বুঝাতে লাগল নিজের মর্ম দিয়ে।

অজ্ঞ মাঝি নির্বাক হয়ে গেল।

এত ব্যঞ্জনা ওই সামান্য ছবিতে? সে হাত জোড় করে দীন ভিখারীর মত একখানা ছবি চেয়ে নিয়ে আদাব জানাল তার বন্দিনী আম্মাকে। দেখতে দেখতে মাঝির দু'চোখের কোল বেয়ে দরদর করে ঝরে পড়তে লাগল জল।

'এত আকুল হ'য়ো না তুমি—দিন তো এলো, যে দিন সব জিঞ্জির খুলে পড়বে—ভেঙে-চুরে যাবে যত বাঁধন।'

মাঝি মনে মনে সেই দিনটিই কামনা করে। সে বলে, 'আমি কত্তা মেম্বার হমু—চাঁদা দিমু চাইর আনা। বড় দোষ করছি, জরিবানা করেন আমার।'

'না, না—ও কি বলছ তুমি! তোমরা লেখাপড়া জানো না, সরল কথা বলেছ, তাতে হয়েছে কি!'

বাড়ি পৌঁছে কোন প্রকারে খাওয়া দাওয়া সেরে মন্মথ মিটিংয়ের ব্যবস্থা করে। বুড়োরা বড় একটা ভেড়ে না। পাঠশালার ছেলেদেরই উৎসাহ দেখা যায় বেশি। খাল পারে খোলা জায়গায় মিটিং হবে—ছেলেরা নিমন্ত্রণ করে আসে বাড়ি বাড়ি। কিন্তু রমেশ কর্মকারের কাছে নিজেই যায় মন্মথ। আর রতন মোড়লের কাছেও। একজন হবে প্রেসিডেন্ট আর অপর ব্যক্তি সেক্রেটারী।

প্রেসিডেন্টের জন্য একছড়া মালা চাই। ছেলেরা সারা বাগান খুঁজেও ফুল পায় না। যে দু'চারটা আছে তাতে হবে কি! অবশেষে অনেকগুলো ফুলই পাওয়া যায়—ঘেঁটো ফুল। তাই দিয়েই মালা তৈরি করে ছেলেরা। শুধু মধ্যে মধ্যে ঝুরি জবার কুঁড়ি দেয়। দেখতে মন্দ হয় না।

শ্লথ মন্থর পায়ে লাঠি ভর দিয়ে আসে লোলচর্ম রমেশ। বয়স প্রায় আশি। তাকে হাত ধরে, মন্মথ একখানা চেয়ারে বসায়। তখনি গুঞ্জন ওঠে সভায়। ব্রাহ্মণ কায়স্থ ওঠে ক্ষেপে। কি কর্মকারের এত স্পর্দ্ধা!

'ছিঃ! চাটুয্যে মশায় আপনি বলছেন কি! ঘোষাল মশাই বা বলছেন কি? রমেশ আজ কি আমাদের অতিথি নয়? তাকে তো আপনাদের অনুমতি নিয়েই নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে!'

অনন্ত বোস বলে, 'এর অর্থ যে এই দাঁড়াবে, আমাদের বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের মাথা হেঁট করাবে তা তো আগে বুঝিনি।'

মন্মথ বলে, 'আমি তো কিছুই গোপন করিনি। এ তো সামাজিক নিমন্ত্রণ নয়। দেশের কাজ—যে অর্থবান, সেই প্রধান, তাকেই সম্মান করতে হবে।'

'কংগ্রেস যদি কামার কুমোরকে প্রাধান্য দেয় তবে তার ভিতর আমরা নেই।'

রমেশ কর্মকারের মুখের সুমুখে এঁরা বলছেন কি? মন্মথর মাথাটা যেন লজ্জায় কাটা যাওয়ার জোগাড় হলো। এঁরা বলেছিলেন যে কেউ এ সভায় আসবেন না, কিন্তু যখন দু চারজন করে লোক সমাগম হতে লাগল তখন একে একে সবাই এলেন। এলেন মজা দেখতে কিন্তু কাণ্ড যা করছেন তাতে পণ্ড হবে সকল পরিশ্রম মন্মথর। এই তো ব্রাহ্মণ কায়স্থর ব্যবহার!

'ছোট বড় দেখে কারুকে তো প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না এবং কারুকে অপমানও করা হচ্ছে না। কংগ্রেস-সেবকের নীতিও তা নয়। তবে সম্মান করা হচ্ছে পয়সার—সে পয়সা কর্মকারের আছে এবং সে তা দেশের কাজের জন্য দান করবে। অতএব তাকে প্রাধান্য না দিয়ে উপায় কি?'

'তা যা বলেছে মন্মথ মিথ্যা নয়, কি বলো ঘোষাল?' বৃদ্ধ চক্রবর্তী ঘোষালের দিকে তাকালেন।

'যদি আপনারা কেউ যাবতীয় খরচা চালাতে রাজী হন, যান

না চেয়ারে গিয়ে বসুন—সভাপতি হন। টাকা তো আর বেশি না। ঘর দুয়ার তুলতে কাগজ পত্র কিনতে এই শ' তিনেক টাকা লাগবে।'

কুলীন কায়স্থ এবং পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা একে একে কেটে পড়েন।

মন্মথ আজকাল অনেক কথা শিখেছে। সে গর্ব অনুভব করে মনে মনে।

রমেশ কর্মকারের গলায় সেই ঘেটো ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। হর্ষধ্বনি ও করতালিতে কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ রাখতে হয় সভার।

ফুলের গন্ধটা যা-ই হোক কিন্তু কেমন যেন মসগুল হয়ে যায় রমেশ কর্মকার। এত বড় গ্রামটায় এত লোক থাকতে তাকে বসান হলো চেয়ারে, আবার তার গলায়ই দেওয়া হলো পুষ্পমাল্য!

এরপর তাকে ঘিরে একটা গান জুড়ে দেয় পাঠশালার ছেলেরা —প্রায় কীর্তনের শামিল।

কে একজন বাদ্যকর—মহিম সানাইদারই হবে বুঝি, ভিড়ের মধ্যে চেনাও যায় না ঠিক—মন্তব্য করে 'গানটা অনসুরা হচ্ছে।' অনেক দিন যাত্রার দলে সে খেটেছে কিনা!

মন্মথ বলে, 'ঠিক করে দাও গেয়ে।'

অনেক দিন বাদে মহিম যেন সুবিধা পেল। এতগুলো দর্শকের সুমুখে গান গাওয়ায় আনন্দ আছে। সে ভক্তি ও ভাবে গদগদ হয়ে গান জুড়ে দিল। কিন্তু বহুদিনের অনভ্যাসে কণ্ঠস্বর তার হেঁড়ে হয়ে গেছে।

অবনী বলল, 'এ তো হলো না—চাই স্বদেশী গান। প্রাণ মাতান সংগীত।'

'কথাটা ঠিকই।' মন্মথ চুপে চুপে পণ্ডিতকে বলল, 'বড্ড ভুল হয়ে গেছে—অবনী কি বলছে শুনুন, পণ্ডিত মশাই। গোড়ায় যদি গলদ থাকে—'

'কিন্তু স্বদেশী গান তো কেউ জানে না—এসব চর্চা তো নেই এখন এদেশে।'

'তবে কি একটা গানের জন্য পণ্ড হবে এত বড় কাজটা?'

মহা সমস্যায় পড়ে যায় সকলে। ওদিকে রমেশ কর্মকার যেমন ভাল কানেও শোনে না, তেমনি ভাল চোখেও দেখে না। সন্ধ্যা সমাগমে সে উসখুস করতে থাকে।

রতন মোড়ল সেক্রেটারী হবে। এসেছিল অনেক আগেই, কিন্তু তার সভার ভিতর এগিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসতে সাহস হয়নি বামুন কায়স্থের জটলা শুনে। এখন গরু বাঁধতে যাবে গোয়ালে। তার আর দেরি সয় না। যা হক করে তাকে বিদায় দিলেই ভাল হয়।

অবনী ইতিমধ্যে গ্রামের ভিতর ছুটে যায়। গিয়ে অমূল্যের পিসীমাকে ধরে আনে। প্রৌঢ়া মালতীর বিয়ে হয়েছিল মুকুন্দ দাসের বাড়ির কাছে। সে অনেক দিনের পুবান কথা। কিন্তু পুরান হয়নি তার কণ্ঠ। গ্রামের উপস্থিত জনতাকে সে ছোটকাল থেকে চেনে। এমন এর মধ্যে কম ব্যক্তিই আছে যে তার শাপ শোনেনি বা গালমন্দ খায় নি। সেই জন্যই সে লজ্জা বোধ করে না। ভারত-বিখ্যাত মুকুন্দ দাসের একখানা স্বদেশী সংগীত গাইতে সুরু করে। এমন মুখরার কণ্ঠে যে এমন অমৃত থাকতে পারে তার স্বাদ শুধু এই সময়ই পাওয়া যায়।

গ্রামের লোক ভেঙে পড়ে।

রতন মোড়ল এসে একখানা চেয়ার দখল ক'রে বসে।

আবার আসেন কুলীন কায়স্থ এবং কলহ প্রিয় তর্করত্ন ও ন্যায়-রত্নরা। মন্মথর ভয় হয়। কিন্তু এবার তাঁরা নীরবেই দাঁড়িয়ে থাকেন।

দৃষ্টি শক্তির তেমন তেজ নেই বলে রমেশ এসব কিন্তু দেখতে পায় না। যেটুকু গান তার কানে যায়, তাতেই সে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কিন্তু রতন মোড়ল পড়ে মহাজ্বালায়। সে যেন কেমন গর্ব ও লজ্জায় চেয়ারও ছাড়তে পারে না, তার পা দু খানার কাঁপুনিও বন্ধ হয় না। আজ যে তার গরু বাছুর কোথায় রইল সে কথাও ভুলে যায়।

গান থামে। রমেশ স্বীকার করে দশ টাকা। তারপর বিশ তারপর বাইশ, অনেক দর কষাকষি করতে করতে বহু চাটুবাক্য বলতে বলতে অবশেষে রফা হয় একশো পঁচিশে। এ টাকা সে কালই দিয়ে দেবে। বাকি যা, তা দেবে রতন মোড়ল—নাম করা ধানী গৃহস্থ, হালে এগ্রামে বড় লোকের পর্যায় ভুক্ত হয়েছে।

অবশেষে সভা ভঙ্গ হয়।

কিন্তু মন্মথর মনে একটা সন্দেহ জাগে।

রমেশ সেদিন মিটিংয়ের পর বাড়ি ফিরে সারারাত বসে কি যেন মনে মনে জমিয়েছে। সকাল বেলা মন্মথ এবং অবনী গেলে, বলেছে, 'ঝোঁকের মাথায় আমি সোয়াশো টাকা স্বীকার করেছি ; কিন্তু ভাই, কেটে ফেললেও আমাকে দিয়ে এত টাকা

চলবে না। না হয় মালা ছড়া ফেরত নাও—অন্য কারুর গলায় দাও গে। রাত্তির বেলা আমি শিশির খাইয়ে রেখেছি।' সে মাত্র পঁচিশটা টাকা বের করে দেয়।

অবনীর রাগ হয়। মন্মথ বলে, 'যথা লাভ।'

রতন মোড়ল মাত্র দিয়েছে বড় দু আঁটি ছোন। নগদ কিছু দেয় নি। বামুন কায়েতেরা তো মহা অসন্তুষ্ট হয়ে রয়েছেন। তাঁদের বাড়ি যাওয়ার আর মুখ নেই এঁদের।

মন্মথ গলদঘর্ম হয়ে যায়। একখানা আফিস ঘর তো তুলতে হবে। যতটুকুই হক প্রথম একখানা ঘর চাই-ই। ছোন পাওয়া গেছে, ঝাড়ে বাঁশও আছে। সুপারি বাগ থেকে খুঁজে বেত ও ঢেঁকির লতা সংগ্রহ করা হয়। পাঠশালার ছাত্রদের নিয়ে মন্মথ ঘর ছাইতে আরম্ভ করে।

'ভিটি কই? ঘর উঠবে কিসের ওপর?' প্রশ্ন করেন পণ্ডিত মশাই।

'অবনী, এমন ভুল মানুষেরও হয়! আনো আগে খন্তা। কাটো মাটি।'

খন্তা আনা হয়। ছেলেরা সারি দিয়ে দাঁড়ায়। নরম মাটি চাকা চাকা করে কেটে দেয় মন্মথ। এর মাথা থেকে ওর মাথায়—ওর মাথা থেকে তার—চাকা চলতে থাকে নিয়ম মত। রসাল এঁটেলি মাটির চাকা বেয়ে বেয়ে জল ঝরতে থাকে সকলের মুখে চোখে। ছেলেরা মুখ মোছে আর মহা আনন্দে কাজ করতে থাকে। সকাল গেছে, দুপুরও গেল—এখন অপরাহ্ণ। সারা হলো একখানা আট-পাঁচ,-তেরর বন্ধ ভিটি বাঁধা। এত খেটেও ছেলের দল হাঁপায় না—শুধু হি হি করে হাসে।

মন্মথ যখন খন্তা ছাড়ে তখন দেখে যে তার হাতে পাঁচটা ফোস্কা পড়েছে। হাত টাটাচ্ছে। তবু তার মুখে একটা সরস হাসি লেগে থাকে। বুকে জ্বলে আশার বাতি। কেউ তার আলো দেখছে না—শুধু মন্মথ সংগোপনে বারবার তা দেখছে—যেমন করে মানুষে চেয়ে দেখে নব জাতকের মুখ।

ঘর ওঠা মাত্র মন্মথ অবনীকে দিয়ে পত্র লিখে জানায় রমানাথকে।

পরের দিন একখানা দৈনিক পত্রিকায় মন্মথর ছবি বের হয়।

এনলার্জ করা হয় পূর্বের তোলা একখানা গ্রুপ ফটো থেকে। একজন নিরক্ষর মজুরের অভিযান। তারপর তার সংক্ষিপ্ত ইতিকথা। কি ভাবে একটা অজগ্রামে একটি শাখা কংগ্রেস-অফিস সৃষ্টি হলো। কত উৎসাহ গ্রাম্য জনসাধারণের! ইত্যাদি, ইত্যাদি নানা শ্রুতিমধুর সংবাদ।

একদিন অবনী বলে, 'মন্মথদা সত্যিকারের যারা গরিব তাদের তো ডাকা হলো না। কাগজে যা-ই বের হক, কাজে যে পিছিয়ে রইলাম অনেকখানি। কেউ পড়তেও আসে না রাত্রে।'

'মোড়ল এবং চাঁইরা তো আসছেন। আসছেন তর্করত্ন ও বোসের বাড়ির সকলে। ওঁদের যখন একবার এমুখো ফেরাতে পেরেছি তখন সুড় সুড় করে এলো বলে গ্রামের আর সকলে—মানে অধম যারা। এই যাদের কথা তুমি বলছ, আমিও ভাবছি। ধীরে ধীরে জমবে তোমার নৈশ ইস্কুলও।'

রতন মোড়ল অন্যান্য বৃদ্ধদের সংগে সারা বিকাল এসে তাস খেলে, তামাক খায় এবং খবরের কাগজ এলে তা যখন জোরে জোরে পণ্ডিত পড়েন, সে মন দিয়ে শোনে।

সেদিন রতন মোড়লের মনে একটা আঘাত লেগেছিল। গ্রামের তাগাদা থেকে সবে ফিরে এসে বসেছে সর্ব-দুঃখ-হারিনী কংগ্রেস আফিসে। ঘাম ঝড়ছে সারা গা বেয়ে, আর মুছে ফেলছে একখানা গামছা দিয়ে।

'আমি যখন সেক্রেটারী হয়েছি, তখন আমাকে অনেক সইতে হবে, কাঁদতেও হবে অনেক। যদি ওদের অবস্থা ফেরে, মন্মথ ফিরুক। আমাদের বাকি-বকেয়াগুলো তো আদায় হয়ে যাবে। কই এতদিন রাজত্ব করছে ইংরাজ, এমন তো বোঝে নি— তোমাদের কংগ্রেস খুব ভাল মানুষ।' তারপর গলার স্বর একটু নামিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'কেউ আসছে নাকি?'

'না।'

'ভাগুক ইংরাজ, আসুক কংগ্রেস—এই তো চাই। আমরা তোমাকে খুব সাহায্য করব। ঐ ছোন ক' আঁটির দাম আর না-ই বা দিলে। আমি খোরাকী দিয়ে একজন পণ্ডিত রাখব। সে নিত্য নিয়মিত নৈশ বিদ্যালয় করবে—ছাত্রদের তামাকের খরচও আমি চালাব—নইলে শালারা আসবে না। একটা প্রলোভন না থাকলে ওরা কিছুতেই ভিড়বে না। সারাদিন খেটে কি সন্ধ্যাবেলা আবার কারুর পড়ায় মন বসে!'

রতনের কথাগুলো খুব ভাল না লাগলেও মন্মথ জবাব দেয়, 'আমি আর কদিন। আপনার একটু নজর থাকলে আর ভাবিনে।'

'নিশ্চয় থাকবে মন্মথ। নিশ্চয় থাকবে। তোমার কংগ্রেস শতায়ু হবে। তারপর আমি ভাবছি খোরাকী দিয়ে একজন পণ্ডিত রাখব যে গোমুখ্যুগুলোকে লেখাপড়া শেখাবে। ইস্কুলের শেষে ওদের নামতা না পড়িয়ে নিত্য বুঝিয়ে-সুজিয়ে কানে ঢেলে দিতে হবে যে মহাজনের একটি কপর্দকও দেনা রাখা মহাপাপ। তারা জন্ম দেয়নি সত্য, কিন্তু বর্ষাকালে ধান চাল দাদন দিয়ে বাপের চেয়েও বেশি করেছে।' তারপর আসল কথাটা রতন মোড়ল বলতে আরম্ভ করে, 'তুমি আশ্চর্য হবে মন্মথ, একটি পয়সা আদায় নেই—একটি কানা কড়িও না। সব ফাঁকিবাজ, স্রেফ বেইমানের দল। এদের শুভ বুদ্ধি ফিরিয়ে আনতে পারলে কে চায় আর ইংরাজ রাজত্ব ? আর কত দেরি কংগ্রেসরাজ হতে ভাই ?'

মন্মথ একটু কটু কণ্ঠে জবাব দেয়, 'একখানা ছোনের ঘর তুলতে না তুলতে চান স্বাধীনতা ! এত সহজ নয় রতনখুড়ো—অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে।'

'আরে তা তো জানি। কিন্তু এই আয়ামটার মধ্যে হলেই ভাল হতো। এখনও ওদের ঘরে কিছু কিছু মজুত শস্য আছে—মানে একটু চাপ দিলে যা দিয়ে ইয়ে দেনা শোধ করবে।'

মন্মথর মনে মনে একটা ঘৃণা হয়। তাই অসমাপ্ত বেড়াখানার বাঁধন বারবার কেটে যায়। কিন্তু কেমন যেন একটা খুশিতেও মন ভরে ওঠে। এমনি করতে করতে চাঁইরা একদিন ধ্বসে পড়বে—জাগবে গরিব দুঃখীরা। কিন্তু খাটতে হবে তাদের মত কর্মীদের ঝড় ঝাপটা অগ্রাহ্য করে।

খাল পারে আফিস ঘরটি দাঁড়িয়ে আছে—নতুন ছোনে ছাওয়া তার চাল। তিন পাশে পাতলা পাতলা নারকেল সুপারির

বাগান। আবছায়ার স্নিগ্ধ আলপনা। রোদ যখন ওঠে পুবের চালটা জ্বল জ্বল করে—একটা সোনালী আভা দেখা যায় দূর থেকে। খাল পারের মাদার গাছগুলোতে অজস্র লাল ফুল ফুটেছে—যেন এই ঘরখানার শোভা বাড়াতেই এদের সৃষ্টি। খালের ওপারেই দিগন্তজোড়া মাঠ। এখন ধান নেই, কিন্তু ধন্য করে রেখেছে এদেশের হাট বাজার। তবে খেতে পায় না যে গরিব জনসাধারণ, সে তো মাঠের দোষ না, মাটিরও দোষ না—দোষ নাকি বিদেশী শাসকদের যত অসমতল বিধানের। এ বিধানও ভেঙে সব একাকার করে দেবে কংগ্রেস।

মন্মথ ঘরখানার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে আর তার বুক আশায় ভরে ওঠে। এই শিশু-গৃহ কত সম্ভাবনা নিয়ে যেন ভূমিষ্ঠ হলো এ দেশের কল্যাণে। আজ আর যতীনকে মাতাল বলে মনে হয় না। মনে হয় একজন পাকাপোক্ত নাবিক—যে জমাট অন্ধকারেও দিগন্তজোড়া নদীর বুকে দেখাতে পারে দিক, দিতে পারে কূলের নির্দেশ।

'কি, অমন করে ওপরের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছ কী? ও আব্বাস, কেমন আছ?'

'কে মিতায় নাকি? আইলা কবে? আমি এদিকে আসতে পারিনা নানান ঝামেলায়। একবার গেলাও তো না আমাগো বাড়ি। সেই কবে গ্যাশ থিইকা গেছ।'

'রোজই ভাবি যাব যাব, কিন্তু সময় পাইনি এ কদিন।'

'হুঁ, তা আর পাইবা কেন!' একটা নিশ্বাস গোপন করে আব্বাস। 'তোমার মিতাইন রোজই কয় তোমার কথা—আপশোষ করে নিত্য। এখন আর কেউ একসের চাউলও ধার দেয় না পাঁচ ওক্তো উপায় থাকলে। তুমি নিজেরটা টানটান রাইখাও আমাগো খাওয়াইছ, সে কথা কি ভুলুম কখনও। মিতা চল না, যাবা একবার আমাগো বাড়ি। তোমার মিতাইন বাঁচে-কি না-বাঁচে।'

'কেন কি হয়েছে?'

'আর কও কেন ভাই—হইছে জল-উদরী।'

'চিকিৎসা করাও না?' কথাটা বলেই লজ্জিত হয়ে পড়ে মন্মথ। সে তো ওর অবস্থা সম্যক জানে। 'অসুখ কি খুব বেশি?'

শীর্ণ আব্বাস একটা ম্লান হাসি হাসে—বিকৃত হাসি। 'মরার আগে তোমারে দেইখা মরলে বড় খুশি হইবে। কত তুমি ভালবাসতা আমাগো।'

'এসব বলছ কি!'

'চল না দেইখা আইবা।' বলে আব্বাস আবার ওপরের দিকে তাকায়।

এতক্ষণে বোঝে মন্মথ কেন আব্বাস বারবার গাছের মাথার দিকে চাইছে। যেমন করে আগেও সে দিন গুজরান করত এখনও সে তেমনি করেই কাটায়। যার গাছের ফল হক বাছ-বিচার নেই। পেশাটা কায়েমী হয়ে গেছে।

আব্বাসের শীর্ণ ও পেশীবহুল হাতখানা ধরে মন্মথ বলে, 'চলো তোমাদের বাড়ি। একি তোমার যে গায় জ্বর—পুড়ে যাচ্ছে শরীর!'

'এই তিন ওক্তো খাই না—কোন কাজ কম্মও করায় না কেউ।'

মন্মথ আব্বাসকে নিয়ে বাড়ি যায়। ঘরে ঢুকে একটু দেরী করে। তারপর ওদের বাড়ির দিকে রওনা দেয়।

সোজা, বাঁধান কোনও রাস্তা নেই। একটা সোঁতা খালের জল কাদা ভেঙেই ওপার গিয়ে দুজনে ওঠে। মহেশের কলাবাগান ছাড়ায়। রতন মোড়লের ধানের গোলা থাকে বাঁয়ে। তার বাড়ির সীমানা ছাড়িয়েই রশি দশেক তফাতে হিংগুলদ্দির ধানের গোলা।

'ইচ্ছা করে ভাইঙা ফেলি, লুট-পাট কইরা নিইয়া যাই।'

'সবুর মিতা উতলা হ'য়ো না। ঐ গোলার মজুত ফসল তোমরাই পাবে—পাবে তোমাদের মত আরও যারা আছে। চাবিটা কৌশলে কংগ্রেস নেতারা এনে দেবেন তোমাদের হাতে।'

আব্বাস অধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, 'কবে মিতা, কবে? কংগরস কি?'

'ওই তো, তাই দেশে আসা—খালপারে ঘর দেখ না? ঐ তো কংগ্রেস।'

হঠাৎ একটা উপোষী কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠতেই থেমে দাঁড়ায় মন্মথ। চোখ দুটোয় কেমন যেন হিংস্র দৃষ্টি। একটু আগেই আব্বাসের চোখে সে অমনি একটা ভাব লক্ষ্য করেছে। পিছেরটা মানুষ বলে কামড়ায় না, কিন্তু ক্ষেপতে কতক্ষণ?

মন্মথকে দেখে সখিনা একটু বিস্মিত হয়; কিন্তু মুখে কিছু বলে না। সে শুয়েছিল দাওয়ায়। কোন রকমে পাশ ফিরে একখানা পিঁড়ি ঠেলে দেয় মন্মথকে। পানের ডালাটায় একটু বাসি পান ছিল। একটা সুপারি সংগ্রহ করে আনতে বলে আব্বাসকে।

মাঘ মাস। এখন গাছে সুপারি না থাকারই কথা। কিন্তু এক ছড়া সুপারি শুকিয়েছিল ডোয়ার পাশের গাছটায়। আব্বাস তরতর করে ওঠে। কে শোনে মন্মথর নিষেধ!

যে সখিনা বলতে গেলে উঠে বসে না—সে অতি কষ্টে একটু যেন ওঠার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। তবু মনে হয় সে যেন খানিকটা সুস্থ বোধ করছে। কয়েকটা উলংগ ছেলে মেয়ে এসে মন্মথকে ঘিরে দাঁড়ায়। তাদের চোখে মুখে লজ্জা ও কৌতূহল।

ঘর দোর আঙিনা পরিষ্কার। পরিষ্কার চালের ছাউনি পর্যন্ত।

'এই মাঘ মাসের শীতে কি করে যে এর মধ্যে কাটাও এদের নিয়ে!'

কি করবে? এবার নাড়া কাটতে পারেনি ধান ওঠার সংগে। তখন নাকি খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল সখিনার। তখন তো পাওয়া যেত মাগনা নাড়া, এখন তো লাগে পয়সা। সে পয়সা কই?

মন্মথর হাতও প্রায় খালি। তবু কয়েকটা টাকা গুঁজে দেয়। কিছু চালও এনেছিল, তাও দিয়ে যায় মিতাইনকে। কয়েকটা মামুলী আশ্বাসের কথাও বলে। রোগ যে জটিল—নইলে সে সম্ভবমত একটা ব্যবস্থা করত। এখন একেবারে এসে ঠেকেছে শেষ সীমায়। অথচ একদিন এই সখিনার শত অভাবের ভিতরও কি ছলবলে গতি ছিল! ছিল চটুল চাহনি। কত রসিকতা করত মন্মথর সংগে।

এ-ও অদৃষ্ট!

না, না, তা নয়—তা নয়। চিকিৎসার অভাব, পথ্য পানীয়র অনটন। যতীন যেন চোখ রাঙায়।

মন্মথ ভুল স্বীকার করে মনে মনে মার্জনা চায়।

সংবাদ শুনে পুলিশ আসে। দেখতে নয়, শাসাতে। সংবাদটা জানিয়েছিলেন তর্করত্ন এবং কুলীন কায়স্থরা।

মন্মথ নাকি সন্দিগ্ধদের নিয়ে রাত্রে রাত্রে আসর জমায়। চুরি ছ্যাঁচড়ামি তাই নাকি দিন দিন বাড়ছে দেশে। নৈশ বিদ্যালয় তো শুধু একটা ভাঁওতা।

খাতা-পত্তর দেখে পুলিশ রতন মোড়লকে ডাকে।

'কি মোড়লের পো?'

'ওই শালা দেশে এসে হুজুর হুজুগ তুলেছে। আমরা নির্দোষী, ওসব বুঝি কি!'

পুলিশ তো না, বাঘ। হুমকি ছাড়ে।...

রতন মোড়ল ঝানু লোক। উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারে। কিছু টাকা নিয়ে আসে। খাতক, প্রজাদের কাছে এত টাকা তার বকেয়া থাকতেও দিতে হয় রোক নগদ। তার বড় দুঃখের ধান বেচা টাকা।

আবডালে বসে হাসেন অনন্ত বোস ও রাজেন শাস্ত্রী।

এবার রমেশের পালা। সে হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে পড়ে। যে একশ টাকা সে কংগ্রেসকে ঠকিয়ে রেখেছিল তার সংগে আর কিছু পুরিয়ে পুলিশকে বিদায় করে।

এবার হাসে অবনী। যদিও তার মনে দুঃখ হয় তবুও একটা আনন্দ অনুভব করে।

মন্মথ যেন চাবুক খায়। এবার সে ছুটে পালাবে কলকাতা। ভয়ে কিংবা ব্যথায় নয়, ছুটি ফুরিয়েছে তার। সৌদামিনী রয়েছে কলকাতায় তীর্থের কাকের মত পথ চেয়ে।

যাওয়ার সময় এক জ্ঞাতি ভাই বলে, 'রান্নাঘরের বেড়া কখানাও যদি সেরে-তেরে রেখে যেতিস তবু এর চেয়ে ঢের কাজ হতো।

এমন একদিন আসতে পারে যখন মাথা গুঁজতে হবে এখানে এসেই। তা না, তুললি একখানা ফালতু ঘর খালপারে। ও দিয়ে আমাদের কী জুড়াবে বল? যাক চিঠিপত্তর লিখিস—মাঝে মাঝে আসা যাওয়াটা করিস।'

'করব দাদা—কিন্তু রমেশ ও রতন সরে দাঁড়াল, তুমি একটু লক্ষ্য রেখো ওদিকে।'

'আচ্ছা, তুই ভাবিস নে। আমি ঝাঁপটা পোক্ত করে আটকে দেব, ঢুকতে দেব না গরু ছাগল। আবার যখন আসবি করিস তোর কংগ্রেস।'

মন্মথকে বিদায় দিয়ে বুড়ো ভাই কাতর হয়ে পড়ে। জ্ঞাতি গোষ্ঠির মধ্যে বুড়োই মন্দের ভাল। মন্মথও ভারী মনে নৌকায় ওঠে।

আবার সে দেশ ছেড়ে চলে—এই নদীবহুল সরস মৃত্তিকার দেশ। এখানের সব মানুষ তাকে চায়নি তবু আব্বাস তাকে চেয়েছে, সখিনা তাকে চেয়েছে—জ্ঞাতি ভাই বুনো মনের জন্য হিংসা করলেও তাকে ভালবাসে—অশ্রুভরা চোখে বিদায় দিয়েছে। সরল অবনী বারবার জানতে চেয়েছে, আবার কবে সে আসবে! এত বড় গ্রামখানায় দুষ্টের অভাব নেই—কিন্তু দরদীও তো আছে।

তাই সমস্ত প্রকৃতিও যেন বিষাদে বিধুর হয়ে রইল মন্মথর মুখের দিকে চেয়ে।

সতের

মন্মথ বলছে—শ্রোতা রমানাথ।

'খুব সুবিধা হলো না।'

'এক মাসের ভিতর আর কি চাও? প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে খেটেই বা কংগ্রেস কতটুকু এগুতে পেরেছে?'

'বাবু, আমার মনে হয় শুধু পার্কে প্যার্কে বক্তৃতা না দিয়ে একটু গ্রাম গাঁয়ের ভিতর ঢুকলে ভাল হত। অনেক লোক আছে যারা উৎসাহী কিন্তু সম্যক জিনিষটা বোঝে না।'

'তারা কখনও বুঝবেও না। তাদের ছেড়ে দাও—যারা বুঝেছে তাতেই এখন চলবে।'

রমানাথের মন্তব্যটা কেমন যেন খাপছাড়া ঠেকে মন্মথর কাছে। তবু সে বিশেষ কিছু বলতে বা প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না কংগ্রেস-সেক্রেটারীর সংগে।

পরের দিন মন্মথ অফিসে গিয়ে অবাক হয়ে যায়। তার মল্লিকাদিদির যে চেয়ারখানি জুড়ে একদিন বসেছিল মৃদুলাদিদি, সেইখানাই অধিকার করে বসে আছে আর একজন নবযৌবনা দিদি।

ওতো দিদি নয়, শয়তানি। এমন যে শান্ত ধীর মন্মথ, তার মনেও ক্রোধ হয়, ঘৃণা হয় চোখ তুলে তাকাতে।

কিন্তু কেন এ ঘৃণা, কেন এ ক্রোধ? ও ও-তো দায় ঠেকে আসতে পারে—হয়ত এসেছেও তাই। এখন আবার ফাঁদে না পা দেয়। মন্মথর ইচ্ছা করে ওর কানের কাছে গিয়ে ওকে সব বুঝিয়ে বলতে—ফাঁস করে দিতে সব ষড়যন্ত্র। আহা! সরল মুখখানির এ হাসি তো বেশি দিন থাকবে না।

'এলে অনেক দিন বাদে কিছু না বলে যে চলে যাচ্ছ?'

'আপনি ব্যস্ত।'

'তা নয়, অপরিচিত লোক দেখেছ বুঝি। দুদিনেই সব চেনা-শুনা হযে যাবে। ইনিও ভাল মানুষ।'

ছোট সাহেবের মন্তব্যে মন্মথ লজ্জিত হয়ে পড়ে।

'এইটি আমাদের হেড মিস্ত্রী, নাম মন্মথ—বড় ভাল মানুষ। আর ইনি হচ্ছেন তোমার অলকাদিদি—কাল এসেছেন।'

মন্মথ সেলাম জানাল।

'কত চিঠি লিখলাম মৃদুলা আর এলো না, জবাবও দিল না। কাজ করেই তো খেতে হবে—পুরান মনিবে দোষ ছিল কি? কেউ আর বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দেবে না, কি বলো মন্মথ?'

'সে তো ঠিক।' একটু থতমত খেয়েও ছোট সাহেবের কথায় সায় দিয়ে বেরিয়ে আসে মন্মথ।

অনেক দিন বাদে সবাই মন্মথকে দেখে কাজ বন্ধ করে ছুটে এলো। মেসিনম্যান, স্ক্রুম্যান, মায় সামান্য মজুর পর্যন্ত। কোথায় গিয়েছিলে, কেন গিয়েছিলে, এমনি হাজার গণ্ডা প্রশ্ন।

'তোমরা গোলমাল করো না, যে যার জায়গা মত গিয়ে বসো —আমি সব বলছি।'

সকলে আবার ফিরে গিয়ে বসল।

'গিয়েছিলাম দেশে, একটি কংগ্রেস অফিস করতে।'

মেসিনম্যান প্রশ্ন করল, 'কেমন হলো ?'

'ভালই হয়েছে।'

একজন দুঃখ করে বলল, 'তবু তো ভাই তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পার, ছোট সাহেব তোমাকে যখন-তখন মাইনে-সমেত ছুটি দেন, আর তুমি হেড মিস্ত্রীও বটে—কিন্তু আমাদের ইচ্ছা থাকলেও কিছু করার জো নেই—একটি বেলা কামাই দিলেই উপোষ।'

'আচ্ছা এই কংগ্রেস কংগ্রেস করে হবে কি ? আমাদের কোন লাভ আছে ?' এবার প্রশ্ন করে রাজেন।

মন্তব্য করে লতিফ, 'যত উকিল বারিষ্টার ভারী ভারী পয়সাওয়ালা লোককা জমায়েত। হামাদের কি রাজেন ? মুটে মজদুরকা কুছ নেহি।'

'তোমাদের নয়, তবে কাদের জন্যে ? এত বড় বড় সব লোক কেন জেল খাটছেন, প্রাণ দিচ্ছেন ? থার্ড ক্লাসে চড়েই বা কেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন মহাত্মা ? তোমরা নেমকহারাম।' মন্মথর মর্মস্থলে যেন ঘা লেগেছে—সে বলতে থাকে। 'জানো, গান্ধীজি তোমাদের দিকে না চাইলে কোটি কোটি টাকা আয় করতে পারতেন ব্যারেষ্টারী করে। দেশের কত নেতাই না সব খোয়ালেন, শেষকালে অকালে জীবন পর্যন্ত দিলেন, তবু তোমাদের মন উঠল না।'

'কে কি করেছেন, একটা নামই বল না ?' একটু ব্যঙ্গস্বরে জিজ্ঞাসা করে রাজেন।

'কেন ঐ যে বড় রাস্তার ওপর অত বড় হাসপাতালটা নজরে পড়ে না তোমার? ওকি এমনি এমনি হয়েছে? জীবনের অনেক কিছু সঞ্চয় দিতে হয়েছে। এরকম উদাহরণের কি অন্ত আছে?'

'ও বুঝেছি—কতকগুলো ইয়ের আড্ডা।'

আর যায় কোথায়। মন্মথ রাগে গনগন করতে করতে ছোট সাহেবের কাছে ছোটে। এক্ষুনি একটু শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে রাজেনকে। কি অশ্রদ্ধা একজন দেশবরেণ্য নেতার ওপর সামান্য মজুরের!

তখন আর ছোট সাহেবের সংগে সাক্ষাৎ হয় না। সাহেব বেরিয়ে গেছেন। নালিশটা আগামী দিনের জন্য মুলতুবি থাকে।

অত্যন্ত সরল ও অনুভূতিশীল মন্মথ নালিশ করতে পারে না। সে রাত্রে মনে মনে বিচার করে দেখে রাজেনের অভিযোগ একেবারে মিথ্যা নয়। এই কিছু দিন আগে রাজেন হাজার চেষ্টা করেও তার অসুস্থ এক বোনকে ঐ হাসপাতালে ভর্তি করতে পারেনি।

তার একটা ক্ষোভ আছে।

এমনি ক্ষোভ আছে আরও জন কয়েকের যাদের কাহিনী মন্মথ নিজে জানে। তারা বহু চেষ্টায় স্ত্রী কিম্বা অন্য কোনো আত্মীয়াকে সন্তান প্রসবের জন্য ঢুকিয়েছিল ওখানে। কারুর বা তদ্বির করার জটিল আবর্ত কাটাতে কাটাতে সন্তান হয়েছে সিঁড়ি-পথে। কারুর বা এমন সব কাটা-সেলাই হয়েছে যা হয়ত না করলেও চলত। অবহেলার দরুণ দু একজন নাকি গেছে মারা। তাই তো নিমাইয়ের সংসার স্ত্রীর অভাবে আঁধার।

মন্মথকে দেখলেই বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে নিমাই দাস—ট্রাম কণ্ডাক্টার। 'এ হল কি দাদা?'

একদিন মন্মথও দেখতে গিয়েছিল নিমাইয়ের স্ত্রীকে। সে তখন মৃত্যুশয্যায়—সেপটিক।

নিমাই ডাক্তার ও লেডি ডাক্তারদের মরিয়া হয়ে যত প্রশ্ন করে—ওঁরা উত্তর না দিয়ে নিজেদের ভিতর কি যেন একটা হালকা বিষয় নিয়ে চোখ ঠারাঠারি করেন।

মন্মথ ভাবে, একজন যথাসর্বস্ব দান করে গেছেন—আর এঁরা তাঁর মান কি ভাবে বাড়াচ্ছেন! হায়রে দুনিয়াদারী!

মন্মথ না বললেও কথাটা কি করে যেন ছোট সাহেবের কানে ওঠে। মন্মথ শংকিত হয়। সে ছুটে যায় ছোট সাহেবের কামরায়। দেখে বিচার আরম্ভ হয়ে গেছে।

'কথাটা তুমি ফিরিয়ে নাও, রাজেন।'

'আমি তো অন্যায় বলিনি, স্যার।'

'তুমি একজন ভারতপূজ্য পরলোকগত নেতাকে অপমান করেছ।'

'আপনি ভুল বুঝেছেন।'

'আর তুমি যা বুঝেছ, তা অভ্রান্ত—বাতুল।··· ক্যাশিয়ার বাবু, একে এর পাওনা বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় করে দিন।'

মন্মথ বাধা দেয়, 'বাবু—' তারপর তার কথা বন্ধ হয়ে যায় অধিরতায়। সে শুধু দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

তারপর আবার বলে, 'আমার কথা তো কিছু শুনলেনই না।'

'দরকার নেই। যা শোনার তা তো কারখানার অনেকেই শুনেছে কাল।'

মন্মথ আবার বাধা দিতে যায়, কিন্তু পারে না। রাজেন কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যায়। মন্মথ দাঁড়িয়ে থাকে পুতুলের মত।

রাজেন টাকা পয়সা বুঝে পেয়ে ফের আসে ছোট সাহেবের ঘরে। 'স্যার, আমি চললাম। কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদেরও যদি সমালোচনা করতে ভয় পাই তা হলে যে আরও বেশি অশ্রদ্ধা করা হয় একজন স্বর্গত নেতাকে, তা আপনারা কেউ তলিয়ে দেখলেন না। আমি স্বচক্ষে অনেক দেখেছি।'

'যা দেখবে তাই নিয়েই যে সমালোচনা করবে এসব আমরা সহ্য করতে পারিনে। বিশেষত একজন দেশবরেণ্য নেতা যাতে জড়ান।'

রাজেনকে ছোট সাহেব বিদায় দিলেন এই ভেবে যে, এমন তীক্ষ্ণ লোক তাঁর কারখানায় রাখা নিরাপদ নয়—তারপর সে তো একটা অন্যায় করেছেই।

রাজেন চলে গেল।

একেবারে হতভম্ব হয়ে রইল মন্মথ। ছোট সাহেবের এমন মেজাজ সে পূর্বে কখনো দেখেনি। একি মূর্তি আবার!

আঠার

সারাদিন আর কাজে মন বসেনা মন্মথর। কিছু সে করেনি, তবু মনে হয় সে-ই যেন অপরাধী। কারখানার ভিতরও একটা থমথমে ভাব। সকলে যেন পাইকারী হারে মার খেয়েছে। এদিকে ওদিকে গুঞ্জন চলে চুপি চুপি। মন্মথর সংগে কেউ বিনা প্রয়োজনে কথা বলতে আসে না। মন্মথও বাধ্য হয়ে নীরব থাকে।

আজ সে পাঁচটা না বাজতেই বেরিয়ে পড়ে। অন্যদিন হলে ছোট সাহেবকে সেলাম জানিয়ে যেত—আজ তার নিত্যকার রুটিং বদলে যায়।

পথ চলতে তার দেরি হয় অত্যন্ত। সময়তে ভুল পথেও সে চলে যায়। এ কি অমানুষিক বিভ্রান্তি!

একটা ট্যাক্সির হর্ণ শোনা যায়। একেবারে তার পিঠের কাছে এসে ব্রেক কষে। 'এই আন্ধা!' মন্মথ চেয়ে দেখে সহরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে—ট্যাক্সিতেও সন্ধ্যা। তার পাশে একজন তরুণ উপবিষ্ট।···চকিতে মোটরখানা চলে যায়। মন্মথ ভাল করে কিছু ঠাহরও করতে পারে না।

কিন্তু মন্মথ ভাবে: তার সন্ধ্যাদিদি আর এক ধাপ উঠল, না নামল? ভিতরে ভিতরে তার যেন কেমন একটা ঔৎসুক্য হয়। অনেক দিন পরে সে সন্ধ্যার বাড়ির দিকে চলে। বাড়িটা খুঁজে বার করতে তার একটু দেরি হয়। অবশেষে সে যে বাড়িটা ঠিক

করে তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ায় .তার চেহারা যেন বদলে গেছে। কেমন সুন্দর রং করা হয়েছে অন্দর-বাহির। ইঁট-পাটকেল-খসা বড় একটা ফাটাল ছিল দোর গোড়ায় এখন তার চিহ্ন পর্যন্ত নেই। একটা ভাঙা ঘর মেরামত করে গাড়ি রাখারও বন্দোবস্ত হয়েছে। এতখানি যে বাড়ির পরিবর্তন হয়েছে, তার বাসিন্দার মনের না জানি আরও কতদূর হয়েছে পরিবর্তন! মন্মথ ভিতরে ঢুকতে সাহস পায় না।

'এই পানওয়ালা বলতে পার—এ বাড়িতে কে থাকেন?'

'বলতে পারি, কিন্তু পয়সা লাগবে।'

'কেন?'

'তুমি—' একটু ভাল করে মন্মথকে লক্ষ্য করে পানওয়ালা বলে, 'তুমি পয়সা দিলেও এখানে পাত্তা পাবে না।'

মন্মথ ইংগিতটা হজম করে নিয়ে দোকান ছাড়ে।

কোথায় যাবে? কার কাছে খোঁজ নেবে? সন্ধ্যার জন্য তার মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আবার সে বাড়ির কাছে গিয়ে উজ্জ্বল প্রকোষ্ঠগুলোর দিকে চেয়ে থাকে। মুস্কিল! কাউকেই তো দেখা যায় না!

'চোরের মত কি খুঁজছ মন্মথ?'

'কে? সীতারাম!'

'তুমি অসময়ে এখানে যে মন্মথ?'

'সন্ধ্যাদিদির কোঠী কোনটা বলতে পার? আমি অনেকদিন আসিনি।'

'তবু তুমি ভুল করনি—কিন্তু এখন এখানে সন্ধ্যাদিদি নেই—আছেন নতুন মেম সাহেব।'

মন্মথ একটু কি যেন ভেবে বলে, 'চললাম সীতারাম, অনেক রাত হয়ে গেছে।' কিন্তু একটু পরেই সে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করে, 'বলতে পার কোথায় উঠে গেছে সন্ধ্যাদিদি ?'

'না।'

তা হলে আজ যাকে সে নতুন একখানা ট্যাক্সিতে অপরিচিত একটি ভদ্রলোকের সংগে দেখেছে সে সন্ধ্যা ছাড়া অন্য কেউ নয়! হয়ত নতুন কোথায় ও চাকরী ধরেছে। তবে ভুল দেখেনি মন্মথ!

রাস্তায় এত আলো থাকতেও মন্মথ চলতে চলতে ভুল পথে চলে যায়। যে গলিটা দিয়ে তাড়াতাড়ি পাড়ি দিয়ে তাদের বস্তির দিকে যাওয়া যায়, সেইটায় না ঢুকে অন্য একটা গলিতে ঢুকে পড়ে। সেটা দিয়েও যে যাওয়া যায়না তা নয়, তবে ঘুরতে হয় একটু বেশি—আর সরু চাপা গলি। এ অঞ্চলের সাধারণ রূপজীবিনীদের বাস। দুয়ারে দুয়ারে এক একটি লম্ফ—তার চারদিকে গুটি কয়েক মেয়ে মানুষ। মাঝে মাঝে আনাগোনা ও দরদস্তুর করছে সেই স্তরেরই খদ্দের।

ওকে ? তার সন্ধ্যাদিদি না দাঁড়িয়ে ? মন্মথ ভাল করে চেয়ে দেখে। তবে মোটরে যাকে দেখেছে সে সন্ধ্যা নয় হয়ত বা হবে। মন্মথ লজ্জায় ছুটে পালায়, পাছে আবার তাকে খদ্দের ভেবে না এগিয়ে আসে! যদি মুখোমুখি হয়ে যায় তবে সন্ধ্যাই বা মন্মথকে কি ঠাহর করবে ?

মন্মথ পালাতে পারে না। পিছন থেকে কাপড়ে টান পড়ে।

'এখন আর আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। যখন দেখা হয়ে গেছে তখন একটু বসে যাও। কথা আছে। ভেবেছিলাম আর বুঝি দেখা হবে না।'

খরগোস যেমন শিকারী বিড়ালের থাবায পড়লে কাঁপতে থাকে, তেমনি কাঁপতে কাঁপতে মন্মথ সন্ধ্যার পিছে পিছে একখানা খোলার ঘরে এসে ঢোকে। কোন আসবাব নেই—শুধু একখানা তক্ত পোষের ওপর সামান্য মাদুর পাতা।

'ছোটদিদি আর মা কোথায় ?'

'তারা অন্য এক বাসায আছে। এক দুর সম্পর্কের মামার বাসায। কিন্তু সেখানেও আর বেশি দিন থাকতে পারবে না। তাদের যেমন জাযগা নেই, তেমনি সংগতিও নেই দুজন বাড়তি মানুষের ভরণ-পোষণ করার। আর জানই তো মা নিতান্ত অসুস্থ, আর মিনুটাও ছোট। তারা তো গতর দিয়েও কিছু সাহায্য করতে পারে না।

'তোমরা ও বাসা ছাড়লে কেন ?'

'দায ঠেকে।'

আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয না মন্মথর। কেমন করে যে একটি ভদ্রলোকের মেযে হঠাৎ এমন নীচের ধাপে নামতে পারে, তা সে কল্পনাও করতে পারে না ।

একটা মাতাল অশ্রাব্য বকাবকি করে ওঠে। তাই শুনে খিলখিল করে হেসে ওঠে এক পাল মেযেলোক। সংগে সংগে ভেসে আসে মদের গন্ধ।···

মন্মথ জীবনের অনেকটা মূল্যবান সমযই বস্তিতে কাটাল এবং বাকি দিন কটাও বোধহয় বস্তিতেই কাটাবে। সে বস্তিও কদর্য, কিন্তু এর তুলনায তা স্বর্গ। মন্মথর শ্বাস রোধ হযে যেতে চায়।

'যার জন্য তোমাকে ডেকেছি তা তো শুনলে না ? তুমি যেন কেমন অন্যমনস্ক হযে রযেছ ? তোমার কি শরীর খারাপ ?'

শুষ্ক কণ্ঠে মন্মথ জবাব দেয়, 'না।'

লম্ফটা একটু উস্কে দিয়ে সন্ধ্যা বলে, 'গোটা পঞ্চাশেক টাকা ধার দেবে?'

'টাকা দিয়ে কি করবে?'

'টাকা দিয়ে মানুষে কি করে জানো না? এবার ছেলে মানুষের মত কথা বললে তুমি।' সন্ধ্যা একটু হাসে।

মন্মথ মুখ তুলে দেখে যে সে সন্ধ্যায় আর এ সন্ধ্যায় আকাশ পাতাল ব্যবধান। তখন ছিল বালিকা এখন যেন হয়েছে প্রৌঢ়া। সংসারের রূঢ়তা এবং বাস্তবের সংগে সংগ্রাম করে যেন সঞ্চয় করেছে কঠোর অভিজ্ঞতা। তার ছাপই পড়েছে তার সারাদেহে। অথচ এ কদিনের কথা!

'তুমি এখানে থাকতে পারবে না—এখান থেকে চলো।'

'কোথায় যাব?'

'আমার সংগে।'

'তারপর?'

'বাসায় গিয়ে চিন্তা করব।'

'ফাঁকা কথায় আমি আর ভুলব না মন্মথ। সত্যি সত্যি একটা যদি পয়সা আয়ের পথ না করে দিতে পার, আমাকে এখান থেকে নিও না—আর আমি যাবও না। ছোট সাহেব আমাকে ঠকিয়েছে, আমি দুনিয়া সুদ্ধু ঠকাব। ভেবেছ এখানে কি আমি বেশি দিন থাকব? আমি বাড়ি করব, গাড়ি করব—ভবিষ্যতের জন্য সব করব।'

'কিন্তু কার জন্য বাড়ি গাড়ি—কার জন্যই বা ভবিষ্যৎ?'

'তা এখন পর্যন্ত ভেবে দেখিনি। ভবিষ্যতের কথা বলছি বটে, বর্তমানই যে আমার পক্ষে অসহ্য।'

'তুমি কোন চাকরী-টাকরী করতে পার না?'

'আমি তো তেমন লেখাপড়া কিছু জানিনে। তবু একটা ভরসা দিয়েছিলেন তোমাদের ছোট সাহেব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম তাও স্রেফ ভাঁওতা।'

'আবার চেষ্টা করে দেখ, সব মানুষই আর এক রকম নয়।'

এবারও হাসে সন্ধ্যা। একটা রহস্যপূর্ণ ব্যঙ্গ হাসি।

'কি হাসলে যে?'

'তোমার বুদ্ধির দৌড় দেখে। একটা ভাত টিপে আমরা এক হাঁড়ি ভাত নামাই। যেখানেই চাকুরীর খোঁজে যাব সেখানেই এক আহুতি।'

'তোমার মাথা গরম হয়েছে।'

'যদি হয়ে থাকে ভাল। তুমি আমাকে পঞ্চাশটা টাকা সাহায্য করতে পারবে কিনা তাই বলো? আমি এখন সাহায্য বলে নিচ্ছি বটে কিন্তু শোধ করে দেব। আমাদের শরীরটাই সব, সেইটা বিক্রি করেই বেঁচে থাকতে চাই। এতে তোমাদের আপত্তি করার কি আছে!'

'মান সম্মান—'

'চুপ করো, চুপ করো মন্মথ।' তারপর হঠাৎ সন্ধ্যা কেঁদে ফেলে, 'মা যার খেতে পায় না, বোন যার যখন-তখন মার খায় পরের হাতে তার আবার মান সম্মান। টাকা চাই মন্মথ, যেমন-তেমন করে চাই টাকা।'

সেদিন আর মন্মথ কিছু বলে না। বিদায় নিয়ে বাসার দিকে

ফেরে। যাওয়ার সময় সে এইটুকু জানিয়ে যায় যে, টাকা পঞ্চাশটা অবশ্য সে দেবে কিন্তু এ পথ, পথ নয়। সন্ধ্যার অন্য পথেরই সন্ধান করা শ্রেয়।

মন্মথ এক দিনে কিছু করতে পারে না। তার তো জমান তহবিল নেই। সে ধার কর্জ করার কথা চিন্তা করে। কার কাছে গেলে ভাল হয়? প্রথমই তার মনে পড়ে রমানাথের কথা। ছোট সাহেবের কাছে গেলেও সে যে কিছু টাকা ধার না আনতে পারে তা নয়। কিন্তু মেয়ের বিয়ের কর্জই তো এখন পর্যন্ত শোধ হয়নি।

'কাল তোমাকে দেখিনি কেন মন্মথ?' রমানাথ জিজ্ঞাসা করেন।

মন্মথ সমস্ত খুলে বলে। তবে ছোট সাহেবকে জড়ায় না। শুধু অভাবের তাড়নায় যে একটি মানুষ বিপথে চলে যাচ্ছে এবং সে পুরুষ মানুষ নয়—বাঙালী ভদ্র ঘরের যুবতী মেয়ে একটি, সেই কথাটার ওপরই সে বেশি করে জোর দেয়। 'বাবু বড় দুঃখে পড়েছে, বড়ই বিপন্ন।'

'তাই তো মন্মথ, বড় সমস্যার কথা।'

'শুধু সমস্যা নয় লজ্জার কথাও বটে। আপনি আমাকে পঞ্চাশটা টাকা ধার দিয়েই রেহাই পাবেন না—একে রক্ষার একটা উপায়ও বলে দিতে হবে।'

'আমি তো ভেবে কিছু উপায় স্থির করতে পারছিনে। অন্য কোন সমস্যা হলেও কথা ছিল, এ যে অন্নবস্ত্রের সমস্যা। একটির নয় আবার তিন তিনটির।'

মন্মথর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

'কোন বাড়িতে ঝিগিরি—' রমানাথ উচ্চ কণ্ঠে বলেন, 'তোমাদের কারুর ঝির দরকার আছে নাকি? একটি অল্প বয়সের—'

বয়সের ও পোষ্যের কথা শুনে বৃদ্ধ মুরলী ব্যারিষ্টার এবং প্রফেসার নির্মল সেন মাথা নাড়েন। উঁ হু।

'তবে এ যাবে কোথায়?'

একদল গণ্যমান্য ব্যক্তি নীরব হয়ে থাকেন। যত বড় বড় রাজনৈতিক আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়।

'খাবে কি করে? রমানাথ বাবু, বলুন তো…' কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে মন্মথর। সে একটু সামলে নিয়ে এবার অতি নম্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, 'কোনই কি উপায় নেই, আপনারা বড় লোক, দেশের প্রধান, আপনারা মুখ ফিরিয়ে থাকলে চলবে কেন? রমানাথ বাবু, মুরলী বাবু, নির্মল বাবু?'

'মন্মথ তুমি স্থির হও। এমন লোকের জগতে অভাব নেই। তাই কেউ দায়িত্ব নিতে পারে না। একমাত্র কংগ্রেসই সে দায়িত্ব নিতে পারে এবং তাও এখন নয়; স্বাধীনতা এলে পর। তখন বেকার দুঃখীর এ হাহাকার আর থাকবে না। তুমিও তো একটা পূর্ণাংগ মানুষ—কিন্তু কতটুকু কার জন্য করতে পার বোঝ না?'

মন্মথ ঠিক বোঝে না, যেন ওষুধ গেলে। সে স্থির হতে চেষ্টা করে।

এতক্ষণ যাঁরা চোরের মত ছিলেন, এইবার তাঁরা একটু স্বস্তি বোধ করেন।

রমানাথ মন্মথকে পঞ্চাশটা টাকা দেন। সে চলে যায়।

সকলে মন্তব্য করেন, 'লোকটা পাগল।'

রমানাথের একজন বন্ধু বলেন, 'তুমি কোন্ বুদ্ধিতে পঞ্চাশটা টাকা দিলে ওকে?'

'দিলাম ওর টাকাই ওকে। ও-ই ঐ টাকা সংগ্রহ করে এনে দিয়েছিল আমার কাছে—এখন পর্যন্ত জমা করিনি কোন ফণ্ডে।'

মুরলীবাবু বললেন, 'যাক!'

আবার সকলে নানা গভীর সমস্যা-মীমাংসায় মগ্ন হয়ে পড়েন। মুসলিম লীগ, র‍্যাড্‌ক্লিপ, রাউণ্ড-টেবেল ইত্যাদি।

মন্মথর একটা দিন দেরি হয়ে গিয়েছিল। সে দ্রুতপদে হেঁটে চলে। কাউকে কিছু না বলে সে বাড়িটার দোর গোড়ায় গিয়ে থামে। 'সন্ধ্যাদিদি, আমি অনেক ভেবেছিলাম, অনেক বলেছিলাম কিন্তু কিছু করতে পারলাম না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো। এই টাকা পঞ্চাশটা নাও।'

টাকা নেওয়ার জন্য কারুর আগ্রহ দেখা গেল না। ঘরের ভিতর অন্ধকার। 'তুমি রাগ করলে? যদি আমার সংগে যেতে চাও, তবে এখনও চলো। আমার যা আছে তাই দিয়েই তোমার মর্যাদা রক্ষা করব।'

'কার সংগে কথা বলছেন?' একটি মেয়েলোক প্রশ্ন করে।

'কেন সন্ধ্যা—' সংশয়ে মন্মথ থেমে পড়ে।

'সে তো এখানে নেই। কাল রাত্রে চলে গেছে।'

'কোথায় ?'

'কোথায় আবার !' একটু অর্থপূর্ণ হাসি হাসে স্ত্রীলোকটি।

মন্মথ ঠিক বোঝে না, অথচ একটা কিছু অনুমান করতে তার বেগ পেতে হয় না।

'একটি বাবুর সংগে। তিনি নাকি ডাক্তার।' আবার মেয়েলোকটি অর্থপূর্ণ হাসি হাসে।

'ওঃ !'

মন্মথ কংগ্রেস অফিসের কর্তাদের ওপর যেটুকু বিরক্ত হয়েছিল তা আবার ধীরে ধীরে কেটে যায়। চঞ্চলমতি মেয়ে মানুষ, একটা দিন সবুর সইল না !

উনিশ

অনেকদিন ধরেই মল্লিকা ভাবছে একবার শেষ দেখা করে তারপর যা হক সে করবে। স্ত্রীলোকের রূপ যৌবন দেহ—যা কিছু প্রিয় ও সুন্দর সকলই তো সে নিবেদন করেছিল এবং তখন মহা আনন্দে তা গ্রহণও করেছিলেন ছোট সাহেব। কিন্তু তারপর কেন এ অবহেলা? সে অনেক অপেক্ষা করে দেখেছে, অনেক রাত্রি বিনিদ্র জেগেও পথের দিকে চেয়ে রয়েছে, কই কেউই তো তার খোঁজ নিল না। যখন সে ছিল নিষ্পাপ একটি কুসুমের মত তখন ছোট সাহেব এসেছেন দিনের মধ্যে কতবার—রাত্রি গভীর হলেও তিনি উঠতে চাননি। তারপর মল্লিকার হাত ধরে জোর করেই তাঁর অফিসে নিয়ে গিয়েছিলেন, কাজও দিয়েছিলেন।

এর পর থেকে তিনি আসতেন আরও সহজ হয়ে, দাঁড়িয়ে থাকতেন চুম্বকের মত।...

মল্লিকা কাঁপত। কেন কাঁপত সে জানে না, তবু কাঁপত যেমন কাঁপে হীনশক্তি লৌহ কণা। তারপর সে একদিন ঝাঁপিয়ে পড়ল, জড়িয়ে ধরল ছোট সাহেবের কণ্ঠ। ছোট সাহেব তাকে আশ্রয় দিলেন প্রশস্ত বুকে। স্ত্রীলোকের যা কিছু দেওয়ার মুহূর্তে তা পূর্ণ করে দিল সে। দেহের বন্ধনে যে ক্রন্দন উতরোল হয়েছিল তা শান্ত হয়ে গেল। কী মধুর অথচ মর্মান্তিক আনন্দ! কী বহ্নিময়ী সুখকর প্রস্রবণ! একটি মাত্র রাত্রি, একটি মাত্র প্রলয় কিন্তু দিগ্বলয়চুম্বী ঢেউ উঠেছিল মল্লিকার বুকের সাগর ছাপিয়ে।

সেদিন সে বোঝেনি কিছু। তারপর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে সে শ্রীহীনা মলিনা। আজ সে দীন ভিখারিণীর মত। আর আশ্রয় নেই, অবলম্বন নেই, না আছে কোনো চাকরী।

সে কি করবে? কি করে খাবে? কেমন করে প্রতিপালন করে রাখবে ভাই দুটো আর তার মাকে? একবার শেষ জিজ্ঞাসা সে করে দেখবে ছোট সাহেবকে। তার আফিসে সে যেতে পারে কিন্তু লজ্জায় যে তার পা চলে না।

ছোট সাহেব তাকে ভরসা দিয়েছিলেন। বিয়ে যে করবে তা স্পষ্ট করে বলেননি। কিন্তু যা অব্যক্ত ছিল তার ইংগিত ছিল যেন ব্যক্তর চেয়েও অনেক বেশি।

ছোট সাহেব যে পথ দিয়ে সাধারণতঃ অফিস যান, সেই পথের মোড়ে গিয়ে মল্লিকা দাঁড়িয়ে রইল। তখনও নটা বাজেনি, কিন্তু একটু আগে ভাগে গিয়ে অপেক্ষা করাই ভাল। কখন, কোন দিন যান তা তো বলা যায় না।

বড় রাস্তার ক্রসিং। অনবরত মোটর চলছে, রিক্সা, গরুর গাড়ি, সাইকেল।

একই রকম কত গাড়ি যে যাচ্ছে আসছে কিন্তু ছোট সাহেবের গাড়ি কোথায়? দু একবার ভুল করে ফুটপাথ থেকে নীচে নেমে পড়ে মল্লিকা। চোখ দুটো তার আত্মরক্ষায় নয়, অন্য কাজে নিবদ্ধ। সে আকুল আগ্রহে ছোট সাহেবকে,—একান্ত না হলে তার ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে।

একজন পুলিশ এসে বলে, 'এ্যাকসিডেন্ট হবেন।'

কথাটা ঠিক। একটু ম্লান হেসে মল্লিকা আবার ফুটপাথে ফিরে আসে।

এমনি কয়েকবার মল্লিকা নামে ওঠে।

'কি খুঁজছেন? কিছু হারিয়েছে নাকি?' পুলিশটি আবার এসে জিজ্ঞাসা করে।

'না।'

'তা হলে অমনি করছেন কেন?' পুলিশটা মল্লিকার সর্বাংগে একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

'নিজের ডিউটিতে যান।'

'আপনাকে রক্ষা করাও তো আমার ডিউটি।'

একটু বিরক্ত হয়ে সরে গিয়ে একটু দূরে দাঁড়ায় মল্লিকা। একটু পরে আবার সে উসখুস করে ওঠে। নামতে চায় রাস্তায়।

তৎক্ষণাৎ আবার বাধা পায়, 'ফের নামছেন?'

একটু লজ্জিত হয়ে মল্লিকা জবাব দেয়, 'না, না। কটা বাজল?'

'দশটা।'

'ও, তবে আমি চলি।'

'কিন্তু যাবেন একটু সাবধানে। বাসে যাবেন? ক নম্বর?'

নম্বরটা বলে মল্লিকা।

একটা বাস থামিয়ে পুলিশটি তুলে দেয় মল্লিকাকে। 'ধন্যবাদ।'

কিন্তু কেমন যেন একটা অবসাদগ্রস্ত পায়ে নিজের স্থানে ফিরে আসে পুলিশটি।

'দিদি এসেছে মা।'

'কয়লা নেই মল্লিকা—যীশু বিশু বসে আছে।'

'আমার কাছেও তো পয়সা নেই। না, দাঁড়াও দেখছি ব্যাগটায় কিছু আছে নাকি। এই নাও একটা সিকি আছে। আমি ভেবেছিলাম চালই নেই বুঝি।'

'এ বেলা চলবে, কিন্তু ওবেলা যে কি হবে তা একমাত্র ভগবান জানেন।'

'আমিও তো কতগুলো দরখাস্ত করলাম, কিন্তু এক জায়গা থেকেও কোন সাড়া এলো না। যদি একটা পাশও থাকতাম।'

'আর দুটো বছর যদি তোর বাবা বেঁচে থাকতেন তবে কি আজ আর ভাবনা ছিল!'

কয়লা নিয়ে যীশু বিশু এসে উপস্থিত হয়। তারপর তারা গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। হৈ চৈ করে ছেলেরা সব ইস্কুলে যাচ্ছে। ওরাও তো অমনি করে ইস্কুলে যেত। কিন্তু এই কিছুদিন হয় তা বন্ধ হয়েছে।

একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করে, 'কি রে তোরা ইস্কুলে যাবি নে?'

'না আমাদের ভাত হয়নি—তাই মা আজ নিষেধ করেছে।' গম্ভীর ভাবে যীশু জবাব দেয়।

'নারে আমাদের কয়লা—' বিশু শুধরে দিতে যায়। যীশু তার মুখ চেপে ধরে।

জানালা দিয়ে সব কথাই কানে আসে মল্লিকার।

'ঐ যীশুটা বড় মিথ্যেবাদী।' একটিতে মন্তব্য করে, 'মাইনে দেওয়ার মুরোদ নেই—ইস্কুলে যাবে কি?'

বিশু বলে, 'আমার দিদি গাড়ি চড়ে আফিস যায়, তোকে কিনে আনতে পারে।'

'তবে ইস্কুলে যাস নে কেন? মাইনে দিস না কেন?'

কয়েকটি ছেলে হাসে।

অপেক্ষাকৃত একটি বয়োজ্যেষ্ঠ ছেলে টিটকারী মারে, 'জানি জানি গাড়িটা কার!'

মল্লিকা লজ্জায় মরে যায়।

যীশু বিশু এবার একত্র হয়ে বলে, 'গাড়িটা আবার কার? আমাদের। ছোট সাহেব দিয়ে দিয়েছেন।'

'তোদের দিদিকে—না?' আবার হাসি।

ছেলেরা চলে যায়। যীশু বিশু কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির ভিতর আসে। 'দিদি, একবার তুমি আফিস যাও না—আজই যাও—নিয়ে এসো গাড়িটা চেয়ে। ওদের একবার দেখিয়ে দি।'

'আজই যাব, তোমরা কেঁদো না। গাড়ি আনব, তোমাদের মাইনে দেব—সব করব।'

যীশু বিশু শান্ত হয়ে মার কাছে যায়।

কতবার মল্লিকা এদের ইস্কুলে ভর্তি করে দিল, কিন্তু বারবারই এমন নাবালকের ভাগ্যেও জুটল বিড়ম্বনা!

বেলা তিনটা বাজার সংগে সংগেই মল্লিকা আবার বাড়ি থেকে বের হলো। পয়সা নেই। হেঁটেই যাবে এবং ফিরবে হেঁটেই সেই কেল্লার কাছ থেকে। পথ তো কম নয়। তাই একটু সকাল সকালই বের হলো সে। হরিশ মুখার্জি ষ্ট্রীটের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে দেখল একটা বড় বাড়ির ফটকের সামনে একখানা বিজ্ঞাপন। ছুটি মেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই পড়ছে। মল্লিকাও এগিয়ে গেল।

'আমার স্ত্রীর সহকারিণী হিসাবে একটি সুস্থ স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী যুবতী চাই। খাওয়া থাকা ফ্রী—পারিশ্রমিক মাসিক পঁয়ত্রিশ টাকা। সাক্ষাৎ করিবার সময় বৈকাল পাঁচটা হইতে ছয়টা।'

মল্লিকা ভেবে দেখল ছোট সাহেবের দেখা পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। তার চেয়ে বরঞ্চ এখানে চেষ্টা করলে মন্দ হয় না। কিন্তু এখানে কি কিছু হবে? যেন বিয়ের কন্যার বিজ্ঞাপন। সুস্থ-স্বাস্থ্যবতী-সুন্দরী-যুবতী—একেবারে চার চারটা বিশেষণ! তার বুকের ভিতরটা একটু দোলা দিয়ে ওঠে। মনটা ওঠে কেমন করে যেন।

তার না ছিল কি? ঐ চারটা বিশেষণকেও ছাপিয়ে আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। তা তার অপার লাবণ্য, কোমল মসৃণ ত্বকের আড়াল দিয়ে তা ফুটে বের হতো—যেমন চিক্কণ মসৃণ পর্দার ফাঁক দিয়ে ঠিকরে পড়ে গোলাপী আলো!

অন্য দুটি মেয়ে মল্লিকাকে এসে দাঁড়াতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনিও কি প্রার্থী?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে এখানে আর আমরা মিছামিছি দাঁড়িয়ে করব কি?'

'কেন, দাঁড়ান না! কার হয় কে জানে।'

'আপনি কি ঠাট্টা করছেন?'

'কেন ঠাট্টা করব দিদি?' এইবার মল্লিকা চেয়ে দেখে ওদের দুজনার তুলনায় এখনও সে ভগবতী। এ রূপের জন্য মল্লিকা নিজে মোটেই দায়ী নয়, তবু একটু লজ্জা বোধ করে। ওরা ধীরে ধীরে ক্লান্ত পদে চলে গেলে একটা ব্যথাও বোধ করে সে। হয়ত অনেক দূর থেকেই হেঁটে এসেছিল। হয়ত ওদেরও অবস্থা ওর মতই। কিন্তু কি করবে মল্লিকা?…

কিছুক্ষণ বাদে একটি লোক এসে মল্লিকাকে ভিতরে নিয়ে যায়। পরপর এতগুলো কোঠা, এত অপ্রয়োজনীয় সাজসজ্জা সে শুধু দেখেছে ছোট সাহেবের বাড়ি—আর দেখল এখানে। কত ছবি, কত আরাম কেদারা, কত কার্পেট যে রয়েছে! তা ছাড়া এখানে টব, ওখানে ফুলের গুচ্ছ, টেবিল, আলনা—এসব জিনিষের হিসাব রাখতে রীতিমত একজন পাকা গণিতজ্ঞের প্রয়োজন। বাড়ি তো না যেন একটা মিউজিয়ম। একটা প্রকাণ্ড হল ঘরে কয়েকজন লোক বসে বসে কি যেন লিখছে। তাদের মুখে রা নেই। পাথরের মানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু মল্লিকার মনে হল কোন যাদুকর যেন যাদুদণ্ডের স্পর্শে এদের বাকশক্তি হরণ করে নিয়েছে। যতক্ষণ এখানে আছে ততক্ষণ এমনি থাকবে। যখন বাইরে বের হবে তখন এরা হবে জীয়ন্ত। কলরব করবে, হাসবে, কথা বলবে।

একজন অল্পবয়সী মহিলার সুমুখে এগিয়ে দিয়ে মল্লিকার পথপ্রদর্শক বিদায় নিল।

'বসো। নাম কি তোমার ? এথানে থাক কোথায় ?'

'নাম মল্লিকা বসু—থাকি কালিঘাট।'

'তোমার বিয়ে হয়েছে ?'

'না।'

'কিন্তু চেহারা যে ঝলসে গেছে অনেকখানি।'

মল্লিকা চুপ করে থাকে।

'তুমি কি পর্যন্ত লেখাপড়া শিখেছ ?'

'এই সেকেণ্ড ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছি। অসময়ে বাবা মারা গেলেন কিনা।'

'তা বেশি পড়াশুনা দিয়ে আর হবে কি, বেশি রূপেরই বা প্রয়োজন কি। বলতে গেলে করবে তো ঝির কাজ।'

'হক ঝির কাজ, নতুবা যে কোন কাজ—আমি আমার সামর্থ্য মত সে কাজে অবহেলা করব না।'

'কিন্তু একটা কথা। সাহেব ডাকলে তাঁর কাছে ঘেঁষবে না। আগেই তোমাকে বুঝিয়ে দিলাম। এই কথাটাই কেউ রক্ষা করতে পারে না, তাই মাসে মাসে লোক পালটাতে হয় সময়তে সপ্তাহে।'

মল্লিকা ছোট্ট একটি জবাব দেয়, 'আচ্ছা।'

'তুমি কবে থেকে আসতে পারবে? রাতদিন এখানে থাকতে হবে কিন্তু।'

'তা জানি। কাল বিকাল থেকেই কাজ আরম্ভ করব।'

'আচ্ছা বেশ, তবে আজ যাও।'

মল্লিকা রাস্তায় বের হয়েই চিন্তিত হয়ে পড়ল। এ বেলা যে চাল বাড়ন্ত। এ বেলা কেন, সে যতদিন মাইনে না পাবে ততদিন তো চালিয়ে নিতে হবে।

মন্মথ আজ সকাল সকালই বাড়ি ফিরেছে। শরীরটা তার ভাল না। সন্ধ্যা ঐভাবে যাওয়ার পর থেকে তার শরীর ও মনের ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। সে বাড়ি ঢুকে অবাক হয়ে গেল। তার ইন্দ্রানী দিদি! অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই—হঠাৎ!

'কিসে বসতে দিয়েছ ? ভাল চাদরটা পেতে দাও।' মন্মথ তাড়াতাড়ি একটা বোঁচকা খুলতে যায়।

'না, না, তুমি কি পাগল হয়েছ ? এই আমি বেশ বসেছি।'

মন্মথ তবু নিরস্ত হয় না। বোঁচকা খোলে। ভাল চাদরখানা বের করে। তারপর আর না বসে উপায় থাকে না মল্লিকার।

'তুমি তো আর আমাদের ওদিকে পা দাও না—আর এখন তো যাওয়ার কোন কারণও নেই।'

'না না, তা নয় দিদি—এই নানা ঝামেলায় হয়ে ওঠে না। তারপর সব কেমন আছে ?'

'কোন রকমে দিন কেটে যাচ্ছে।' তারপর একটি একটি করে সমস্ত অভাব অভিযোগ অসুবিধার কথাই খুলে বলে মল্লিকা।

মন্মথ মল্লিকার মুখের দিকে আর চাইতে পারে না। কি মানুষ কি হয়ে গেছে। প্রথম যেদিন সে মল্লিকাকে দেখেছিল তখন মন্মথ কি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পেরেছিল স্বর্গের ইন্দ্রানী একদিন ভিখারিণী হয়ে তার বস্তির দুয়ারে এসে দাঁড়াবে! মন্মথর প্রাণটা দুঃখে গুমরে উঠল, কিন্তু তলে তলে কেমন যেন একটা আনন্দও সে অনুভব করল। আজ সে দাতা, মল্লিকা প্রার্থী—এ জন্য নয়—আনন্দ হয়েছে সরল নিরভিমানিনী মল্লিকা তার কাছে এসেছে বলে। দারিদ্র্যের মধ্যে যত রূঢ় অভিশাপই থাক না কেন তার ভিতর যেন একটু অমৃতের সন্ধানও সে পেল।

'আমি যে পাঁচটা টাকা চাইলাম, তা এখুনি দিতে হবে—সংগে সংগে একটু বাজারও করে দিতে হবে।'

মন্মথ জবাব দিল, 'এ আর বিশেষ কি। চলো না কি কি কিনে দিতে হবে। আমি এক্ষুনি তোমার সংগে যাচ্ছি।'

একটু পরেই মল্লিকা ও মন্মথ বাইরে বের হলো। কিন্তু সৌদামিনী কটমট করে চেয়ে রইল। মন্মথ মনে মনে বুঝল, এর একটা রেশ আছে।

'তুমি বরঞ্চ বাড়ি যাও, আমাকে সব বলে দাও কি কি লাগবে।'

মল্লিকা একটা মৌখিক ফর্দ ধরল, আর মন্মথর হাতে একটা কৌটা দিয়ে বলল, 'মার জন্য খানিকটা আফিং আনতেই হবে—যেন ভুল না হয়।'

'কিন্তু আজ তো আর পাওয়া যাবে না—কাল।'

'তাই কিনে দিও—ওটা তোমার কাছে থাক।'

মন্মথ যখন সব জিনিষ পত্র কিনে নিয়ে মল্লিকার বাসায় নামাল তখন সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল। এত মাল তো মাত্র পাঁচ টাকা দিয়ে খরিদ করা যায় না।

'এ তুমি কি করেছ?'

'সস্তা হয়ে গেছে দিদি, সব সস্তা হয়ে গেছে। তোমরা মেয়ে মানুষ, কিনতে জান না, তাই রোজ রোজ ঠকে আসো। অথচ আমাকেও তুচ্ছ করে ডাকো না।'

'না মন্মথ, ব্যাপার কি?'

'তা পরে শুনো, ঢের সময় আছে—এখন এগুলো গুছিয়ে রাখো তো।'

মন্মথ সন্ধ্যাকে যে পঞ্চাশ টাকা দিতে পারেনি—তাই তার পকেটেই ছিল। এবং বুকের কাছে কেবল খচখচ করছিল টাকা কটা। হঠাৎ এমন একটা ব্যয় করার সুযোগ পেয়ে যেন তার বুকটায় আরাম বোধ করল। বাজারে সব টাকা সে ব্যয় করেনি;

কিছু নগদ ফিরিয়ে এনে মল্লিকার হাতে দিল। 'এ বিষয় আর কোন প্রশ্নও করো না—উত্তরও চেয়ো না। আমি যা করেছি তা বুঝে-সুঝেই করেছি। যদি আর একটি কথাও বলো তবে বুঝব আমি তোমার নিতান্ত পর।'

'কিন্তু এত টাকা…'

'দিতে যখন পারা যায় তখন কিছুই এত নয়—তুমি খুশি মনে নাও দিদি।'

মল্লিকা আর কিছু বলে না। তার মা জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে থাকে। ইতিমধ্যে যীশু ও বিশু এসে হাজির হয়। তারা আনন্দে করতালি দিতে থাকে। 'আজ আমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন রে, আজ আমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন।'

মন্মথ পকেট থেকে বের ক'রে কতকগুলি লবেনচুষ ওদের হাতে দেয়। মল্লিকাকেও বলে, 'খাও না দিদি দুটো। আমার কাছে তুমিও তো ছেলে মানুষ।'

মল্লিকা হাসি মুখে বলে' 'দাও দাদা, দাও।'

মন্মথর বুকটা ঐ একটি মাত্র মধুর সম্বোধনে নির্মল আনন্দে ভরে ওঠে। অফিসের পর এতটুকুও বিশ্রাম না করে, যেটুকু তার ক্লান্তি হয়ে থাক তা নিমেষে দূর হয়ে যায়। 'দিদি এই সম্পর্কটাই যেন চিরদিন বজায় থাকে।'

পরদিন বিকাল বেলা সময় মত গিয়ে মল্লিকা হাজির হয়।

গৃহিনীর পছন্দ হলেও সাহেবের কাছে নাকি পরীক্ষা দিতে হবে, তাই মল্লিকাকে ঘণ্টা খানেক বসে থাকতে হয়।

সাহেব আসেন—ঠিক বাঘের মত চেহারা, গলাটাও তেমনি।

মল্লিকা ঘাবড়ে যায়। সে নমস্কার করতে হাত তোলে।

অমনি সাহেব বলেন, 'দেখলে তো—আমি আগে বলিনি—বাঙালী ঘরের মেয়েরা তোমার মামজাদা অতিথি-বিতিথের মান রাখতে পারবে না।'

'তবে কি করবে ?'

'আমি তো বলি সেই—'

'বলায় দরকার কি। একেবারে খবর দিয়ে দাও সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে। তুমি তা হলে এসো গে। তুদিনের মাইনে বাবদ এই চারটা টাকা নিয়ে যাও। কি করব, দেখোই তো এখানে সব সাহেব-সুবোর কারবার। এখানে তুমি টিকতে পারবে না।'

মল্লিকা বিদায় হয়ে হাঁফ ছাড়ে। সত্যই সে আর সাহেব-সুবোর তাণ্ডব সইতে পারবে না। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে মানুষেরই কাজ।

কিন্তু অভাবের সংসারে যেন মাস ফুরিয়ে আসে তাড়াতাড়ি। মল্লিকা মরিয়া হয়ে একটা কিছু পাওয়ার জন্য এবং করার জন্য যতই ছুটোছুটি করে ততই নাগালের বাইরে চলে যায় সব। চারদিকে শুধু নৈরাশ্যের কঠিন প্রাচীর। তাকে দাঁত মেলে ব্যংগ করে। সময় সময় যেন তার কানের কাছে কে বলে, 'তুমি যতটুকুই চাও না কেন সংসার তোমাকে কিছুই দেবে না।'

'কেন ? কেন ? কি দোষ আমার ?' প্রশ্ন করে মল্লিকা।

'দোষ তোমার জন্মের। কেন তুমি ধন-কুবেরের ঘরে জন্মাওনি।

'এও কি একটা অপরাধ ?'

'নিশ্চয় ।'

মল্লিকা এ যুক্তি শুনে পাগলের মত হেসে ওঠে ।

মা জিজ্ঞাসা করে, 'তুই যে হাসছিস ?'

'এমনি ।'

আবার কয়েকদিন কাটে। মল্লিকা হাসেও না, বেশি কথাও বলে না। চাকরীর খোঁজে বাড়ি থেকে বেশি বেরও হয় না।

'বাড়ি বসে না থেকে আমাকে যদি একটু আফিংও এনে দিতিস—আমার যে আবার হাত-পা ফুলতে আরম্ভ করেছে ।'

হঠাৎ মল্লিকা নির্বোধের মত হেসে ওঠে।

'তুই পাগল হবি নাকি ? যা বাইরে থেকে একটু ঘুরে আয়। এই কৌটোটা নে ।'

'ঘরে ক দিনের চাল আছে মা ?'

'এই পাঁচ সাত দিনের ।'

'আমি এখানে কিছু দিন না থাকলেও তোমরা সপ্তাহ খানেক চালিয়ে নিতে পারবে, কোন কষ্ট হবে না কি বলো ? হাসলাম কেন শুনবে মা ? অভাবের দরুণ যেন আফিংও তোমার লাগছে বেশি ।'

মা একটু ক্রুদ্ধ হয়ে বলে, 'যত বাজে কথা মেয়ের ।'

'বাজে কথা নয় ।' বলে মল্লিকা বেরিয়ে যায়।

তার মা মনে মনে ভাবে : এখন ও পাগল না হলেই বাঁচি।

* * * *

মল্লিকা পাগল হয় না। তার উদাহরণ পাওয়া যায় সপ্তাহ খানেক পরের দৈনিকে।

ব্যর্থ প্রেমিকার অবিমৃশ্যকারিতা…

আফিং খাইয়া আত্মহত্যা।

পরের দিন তার ভুল সংশোধন করে ছোট ছোট হরফে ছাপা হয়—ব্যর্থ প্রেমিকা নয়, এক বেকার যুবতীর আত্মহত্যা।…

ছোট সাহেবও সংবাদপত্র বন্ধ করেন—মন্মথও ঘরে প্রবেশ করে। 'আর দেরি না করে তুমি একবার যাও। এমনিতেই এ-কদিন দেরি হয়ে গেল।'

মল্লিকাদের বাড়ি গিয়ে মন্মথ শোনে যে মল্লিকার মৃত্যুসংবাদ বুড়ি আর সহ্য করতে পারেনি। সেও কাল মারা গেছে। পাড়ার লোকেরা সৎকার করে এসেছে। যীশু বিশু ঝঞ্ঝাহত দুটি ছাগ-শিশুর মত বসে বসে কাঁদছে। পাড়ার একটি বর্ষীয়সী মহিলা তাদের জন্য কিছু আহারের ব্যবস্থা করছেন।

'তুমি কে?'

'আমি ওদের বড় ভাই।'

'ভাল লোক বাপু তুমি—আজ ক দিনের মধ্যে খোঁজ খবর নেই।'

'থাকি একটু দূরে কিনা।'

একজন ভদ্রলোক বলেন, 'যখন ওদের ভাই নিতে এসেছে, তুমি আর কথা না বাড়িয়ে জিম্মা করে দিয়ে চলে এসো। একটু দেরি করে এসেছে বলে আবার একটা ফ্যাকড়া বের করো না।'

'সেই থেকেই তো তুমি কেবল ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন করছ। যাক চললাম বাপু, এই রইল ওরা, ওদের খাবার ঐ গোছান রয়েছে—তুমি যা হয় বুঝে-সুঝে করো। আমার ইচ্ছা ছিল—সে আর বলে লাভ নেই, বুড়ো শুনলে খেঁকিয়ে আসবে।

'তুমি একটু যত্ন আত্তি করো। এই তুমি তো না, তোমার বৌর কথা বলছি। বড্ড চোট পেয়েছে ছেলে দুটো।'

মহিলা চোখে কাপড় দিয়ে চলে যান।

কয়েক সপ্তাহ বাদে আবার সংবাদ পত্রের পাতা অলংকৃত হয় ছোট সাহেবের ছবিতে।

ক্রোরপতি পশুপতির বদান্যতা। দুটি নিরাশ্রয় বালকের সম্পূর্ণ ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ···

কংগ্রেস অফিসের ভিতর যাঁরা ছোট সাহেবের বন্ধু তাঁরা গর্বে স্ফীত হয়ে ওঠেন। 'দেখলে তো মন্মথ—বড়লোকের নজর চিরদিনই বড়। কবে কে তার অফিসে চাকরি করেছে, তার ভাইদেরও ব্যথায় তাকে কাতর করেছে। দিন দিন পশুপতি যেমন জনপ্রিয় হচ্ছে, এবার ইলেক্‌সনে দাঁড়ালে পারে।'

কুড়ি

তারপর আর কটা বছর কাটল! কিন্তু এর মধ্যেই ওলট-পালট হলো অনেক। দিনের পর দিন এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যার জন্য নিত্য বদলাতে লাগল ইতিহাসের পাতা।

দুর্ভিক্ষ গেল, কন্‌ট্রোল এলো—এলো কত হাজার ঝকমারী জীবন ধারণে।

কিন্তু বিশেষ কোন মানসিক পরিবর্তন হলো না মন্মথর। তার ধ্যান জ্ঞান রইল একই কেন্দ্রে নিবদ্ধ হয়ে। সে এর মধ্যে নাকি জেলও খেটে এসেছে কিছুদিনের জন্য কংগ্রেসের কাজে গিয়ে। তারপর এসে কষ্ট করে মাস চালিয়েছে, তবু চাঁদা দিয়েছে যেমন নির্দেশ দিয়েছেন স্থানীয় সেক্রেটারী রমানাথ। সে নিজের ভবিষ্যতের জন্য যা জমিয়েছে তা এই ভাবেই জমিয়েছে। সে এটুকু স্থির এবং ধীর ভাবেই বুঝেছে যে তার গচ্ছিত অর্থ দেশ একদিন তাকে ফিরিয়ে দেবে সুদে আসলে—যখন স্বাধীনতা আসবে। মৃদুলা, মল্লিকা, সন্ধ্যা—এমন কি আব্বাসের জন্যও সে যা করতে পারেনি—তা করবে এবং করছে এই তার ভারত-জোড়া প্রতিষ্ঠান।

রমানাথ বলেছেন, 'রাষ্ট্রের স্বাধীনতা না এলে অর্থের স্বাধীনতাও আসে না। তাই তো আমরা এত অক্ষম মন্মথ। তাই তো মল্লিকার মত ফুল অকালে ঝরে গেল।'

'ও কথা বলবেন না বাবু, আমি সইতে পারিনে। তার চেয়ে বলুন কি করতে হবে। আজ কি কোন মিটিং আছে? কোন কাগজ-পত্র গোছাতে হবে?'

আর একদিন রমানাথ খবরের কাগজ পড়তে পড়তে বলেছেন, 'দেশের আর্থিক স্বাধীনতাটা দেশের জনসাধারণের হাতেই আসবে। এই শোন—' তারপর কি যেন পড়ে শুনিয়েছেন মন্মথকে। সে শুনে খুশি হয়েছে। জনসাধারণ বলতে তো ওদেরই বোঝায়।

'বাবু আমাদের কারখানার মজুরেরা ষ্ট্রাইক করতে চায়। ঐ মজুরীতে তাদের নাকি পেট চলে না। কথাটা মিথ্যাও নয়। মালিকদের দুর্দান্ত মুনফা হচ্ছে—কিছু মজুরী বাড়িয়ে দিলে দোষ হতো কি?'

'বাড়িয়ে দেবেন বই কি মজুরী, কিন্তু এখন ষ্ট্রাইক করা উচিত নয়। এ সময় পুঁজিপতিদের যদি অসন্তুষ্ট করে তোলা হবে ভবিষ্যৎ খারাপ।'

'আমিও তো তাই বলি। যাদের হাতে চাবিকাঠি তাদের ক্ষেপিয়ে তুললে সব মাটি।'

'হ্যাঁ, তুমিই ঠিক কংগ্রেসের নীতিটা ধরতে পেরেছ। চেয়ে চিন্তে ধীরে ধীরে নিতে হবে।'

'কিন্তু কতকগুলো পাণ্ডা জুটেছে।'

'লাল ঝাণ্ডা—না? বিলকুল ঠাণ্ডা করে দাও।'

'তা সম্ভব নয়। দিনে দিন দিন ওদের হিম্মৎ বাড়ছে। আর বাড়বে না কেন বলুন তো, ওরা আদপে তো মিথ্যা উসকানি দেয় না।'

'তুমিও একথা বলছ ?'

'দেখে-শুনে আমার তাই তো ধারণা হচ্ছে।'

রমানাথ একটু যেন চিন্তা করেন। তারপর বলেন, 'তুমি ওদের বোঝাতে পারবে না, আমাকে সালিশ মানো। আমি উভয় দিক রক্ষা করে দেব। এখন আত্মকলহ মৃত্যুর লক্ষণ—এ সব ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে।'

রমানাথ এমন ভাবেই কথাগুলো বলেন যেন কারখানার বড় আত্মীয়ই তিনি—মালিক এবং মজুরদের।

বিকালের দিকেই রমানাথ মিটিংয়ে উপস্থিত হন। ছোট সাহেবকেও তিনি ডাকেন। একটা মীমাংসাও তিনি করে দেন। দেশ স্বাধীন হতে আর বিলম্ব নেই। কারণ মন্ত্রী-মিশন আসছেন বিমানপোতে চড়ে। তখন একটা বিশেষ বিবেচনা করা যাবে। মজুরেরা আমতা আমতা করে রাজী হয়।

রমানাথ বিদায় হওয়ার সময় ছোট সাহেব খুশি হয়েই এক হাজার টাকার একখানা চেক দেন। 'আমি তো দেশের নগণ্য সেবক।'

রমানাথের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

মন্মথও গর্ব বোধ না করে পারে না।

আজকাল মন্মথ রোজই এমন কথা শোনে যে তার ভারী মনটাও হাল্কা হয়ে ওঠে। যারা মরে গিয়ে থাক, ঝরে গিয়ে থাক—তারা তো আর ফিরবে না। কিন্তু তারাই তো গড়ে দিয়েছে ভিত্তির গাঁথুনি। সেই ভিত্তির গাঁথুনির ওপর গড়ে উঠছে সুমহান দেউল। সেই দেউলের তোরণ দুয়ারে সকল তীর্থ যাত্রী দীর্ঘ মাস ও দীর্ঘ বর্ষ হেঁটে এসে ক্লান্ত পায় থেমেছে।

'আমরা স্বাধীনতার তোরণ দুয়ারে !'

তাইতো একথা উচ্চারণ করতে সাহস পেয়েছেন রাষ্ট্রাধিনায়ক —সকলের পথ-প্রদর্শক।

বলতে গেলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণদামামা থামলেও তার রেশ এখনও থামেনি, ভারতের রাষ্ট্র পঞ্জীতে যুগসন্ধির একটা প্রলয় লগ্ন চলছে কিন্তু সে-সব দিকে মোটেই খেয়াল নেই মন্মথর। সে সকল তীর্থ যাত্রীর সংগেই যেন তোরণ দুয়ারে এসে থেমেছে। উৎসাহে তার মৃত মনও সঞ্জীবিত হয়ে আবার ডানা মেলেছে। সে স্পন্দমান বক্ষে অপেক্ষা করে রয়েছে কখন দেউলের দ্বার মুক্ত হবে—দেখবে তার জীবনবল্লভকে। কোটি কোটি উৎসুক জনতার সংগে সেও চেয়ে থাকে।

কিন্তু একদিন বড় আঘাত পেল মন্মথ। সে ছুটে এল রমানাথের কাছে।

এই ভারতবর্ষ নাকি ভাগ হয়ে যাবে, বিভিন্ন হবে হিন্দু মুসলিম স্বার্থ?

'কে বলেছে এ কথা ? আমরা তা স্বীকার করিনি।'

তখন মন্ত্রী-মিশন বুঝি শেষ বারের জন্য ম্যাজিক দেখাতে আরম্ভ করেছে ভারতের মাটিতে পা দিয়ে। বুঝেছে নরম মাটি—শুধু দাগ টানলেই সহজে ভাগ হয়ে যাবে। আচ্ছা প্রথম তাসের খেলাই দেখান যাক। অদ্ভুত খেলোয়াড় এই সাহেবের দল।

'এই হিন্দুস্থান...'

'ঐ পাকিস্তান...'

তাস একখানাই। কিন্তু হিন্দুরা যখন চেয়ে দেখে তখন কেয়াবাৎ হিন্দুস্থান...

আর মুসলমানরা যখন চেয়ে দেখে তখন কেয়াবাৎ আজাদী পাকিস্তান···

কংগ্রেস পড়ে মহা ফ্যাসাদে।

সে এ ফ্যাঁসাদ কি করে এড়াবে? সে জাত দিয়েছে সকলকে। হিন্দু-মুসলমান-আর্য-অনার্য-বুদ্ধ-খৃষ্টান-হরিজন ভালবেসেছে সকলকে। সময়তে সে কাঁদে, সময়তে সে বায়না ধরে।

কিন্তু সাহেবরা তাকে ঠেলে রেখে যেতে চায় হিন্দুর ঘরে···

কথা হয়েছে পাকাপাকি তবু স্বীকার করেন না রমানাথ।

'একটা অসম্ভব কিছু হলেই হলো? তুমি ভেবেছ কি মন্মথ আমরা মানুষ না? অস্বীকার করব দশকোটি মুসলিম ভাইবোনদের? বলে দিলাম দেখো, পাকিস্তান একটা উদ্ভট কল্পনা। কাগজ পড়ো না? এই দেখে যাও কি লিখেছে আজ?' বলে একটা সম্পাদকীয় মন্তব্য পড়ে শোনায় এবং তা তার বক্তব্যের অনুকূলেই লেখা।

কে যেন একজন বলেন, 'তোমরা এখন স্বীকার করতেই বা কে আর অস্বীকার করতেই বা কে? মুসলিম mass শিকারের তো ভার পেযেছেন স্বয়ং জিন্না সাহেব। স্বধর্মীর হাতেই তারা মরবে তবু বিধর্মীর আশ্রয় নেবে না। তোমরা হিন্দুরা যেমন আজকাল কোরাণ-কেতাব পড়ছ—তেমনি গীতার ব্যাখ্যাও আজকাল তারা হৃদয়ংগম করতে শিখেছে। এ বড় কঠিন যুগ রমানাথ।'

'আমরা তো কোন জাতের বিচার করিনে—কংগ্রেস সকলেরই প্রতিষ্ঠান।'

'তোমরা তো উর্বশী—তবে আর কেঁদো না এখন।'

'ফাজলামি করছ? কাঁদছে কে?'

'যাদের বুকে বল নেই—জনসাধারণের ওপর control নেই, বিপ্লবে বিশ্বাস নেই।'

রমানাথ ক্ষেপে ওঠেন। 'সাবধান। যা তা বলো না এখানে বসে।

'ঠিক বলেছেন রমানাথ বাবু!' একজন ছোকরা গোছের শক্তিমান ভলাণ্টিয়ার এগিয়ে আসে।

রমানাথ বুদ্ধিমান মানুষ, রাগটা চেপে যান। 'আমাদের কথার মধ্যে তুমি আবার কি চাও—যাও ফ্ল্যাগগুলো গুছিয়ে রাখার কায়দা দেখিয়ে দাও মন্মথকে।'

মন্মথ ও ভলাণ্টিয়ারটি চলে যায়।

রমানাথ নিজে নিজেই বলেন, 'তোমরা তো যা শুনবে তাই কপচাবে। দেখ না কিসে কি হয়।'

অন্য পক্ষের আর জবাব শোনা যায় না।

এ সব শুনে মন্মথ তেমন সান্ত্বনা পায় না। সে আবার মনমরা হয়ে বাসায় ফেরে।

রমানাথের কানের কাছে কে যেন বলেন, 'ভবিষ্যত অন্ধকার—ঘোর তমিস্রা রমানাথ।'

একুশ

সেই তমিস্রাই দেখতে দেখতে ঘনিয়ে আসে—দুর্যোগ আসে দুর্নিবার হয়ে।

খণ্ড হয় ভারত, ভাগ হয় বাংলা—তবু দাংগা চলে।

ধীরে ধীরে সে দাংগাও থামে। কিন্তু থামে না আমাদের মন্মথ। সে বাসার ভার সৌদামিনীর ওপর ফেলেই উধাও হয়।

পনেরোই আগষ্ট সে এখানে থাকবে না—যাবে দেশে—কাটিয়ে আসবে দুঃখী আত্মীয় স্বজনের মধ্যে। বড় চোট লেগেছে তার মর্মে।

সে ছোট একটা বোঁচকা কাঁধে নিয়ে টিকিট কাটে পাকিস্তানের।

একেবারে তাদের জেলার সদরে গিয়ে নামে। একি! হিন্দুদের বহু ঘরে বাতি জ্বলে না কেন? তারা কি সব দেশ ছেড়ে গেল? সে বোঁচকা কাঁধে এগিয়ে চলে। ঐ না ঝাউতলার জমিদার বাড়ি? সেখানেও আলো নেই। এত বড় রাজপুরী অন্ধকার। কোথায় কংগ্রেস পতাকা? কোথায় আলোকমালা আজ বিজয় উৎসবের দিনে?

মন্মথ পাগলের মত ঘুরতে থাকে।

আবার আর একটা হিন্দু পল্লী। বড় বড় দালান কোঠা সব প্রেতপুরীর মত ঝিমাচ্ছে। এ বাড়িগুলোও কি সব জনশূন্য?

একটি বৃদ্ধের সংগে দেখা। সে নিতান্ত দায় ঠেকে বের হয়েছিল—এখন তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরছে।

'হ্যাঁ মশাই আজ না পনেরোই আগষ্ট?'

বৃদ্ধ ভয়ে অস্থির হয়ে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ সাহেব, হ্যাঁ আদাব।...
মোসলেম লীগ জিন্দাবাদ!'

'আমি হিন্দু, কলকাতা থেকে আসছি।'

বৃদ্ধ এগিয়ে এসে মন্মথর মুখখানা পরীক্ষা করে আশ্বস্ত হয়। 'কেন আবার মরতে এসেছেন এখানে? আমরা কি মানুষ আছি। ঐ দেখুন—' বলে সে কেঁদে ফেলে। 'জোর করে কংগ্রেস পতাকা নামিয়ে পাকিস্তানী নিশান উড়িয়ে দিয়ে গেছে ঘরে ঘরে।'

পশ্চিম বাংলা যখন আনন্দ করছে, পূর্ব বাংলা তখন সদ্য বিধবার মত শোকে কাঁদছে।

যুবতী মেয়েরা ও সুন্দরী বধূরা তো বলির পশুর মত মুহ্যমান হয়ে অপেক্ষা করছে কখন সমন আসে।

'ও কিসের আলো? কিসের শব্দ?'

সরুন, সরুন—পথ করে দেন। মিছিল আসছে মোসলেম-লীগের।'

মন্মথ চেয়ে দেখে হিন্দু পাড়ার সব জানালা কপাট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ভয়ে।

'এখানে আবার নোয়াখালীর মত কিছু না হলে বাঁচি।' ব'লে বৃদ্ধ রাস্তার এক প্রান্তে গিয়ে মাথা নোয়ায়।

মাথা নত করে রইল—যেমন করে হিন্দুরা হয়ত দাঁড়িয়ে থাকত মামুদ শাহ কিম্বা অওরংগজেবের আমলে।

উদ্দাম আনন্দে মিছিল চলে গেল। কেউ মরল না, প্রত্যক্ষ কোন অত্যাচার হলো না—তবু যেন মরে গেছে পূর্ব বাংলার একটা সম্প্রদায়—সে মন্মথর নিজেরই সম্প্রদায়, কংগ্রেসের দুর্ভাগা সেবক গোষ্ঠী।

এ নাকি অনিবার্য এবং অস্বীকাব কবার উপায় নেই।

তাই মন্মথও স্বীকার করে নিয়েছে—কিন্তু কলকাতায ফিরে সে আর যায নি কংগ্রেস অফিসে।

সে ভুলতে পারেনি তার স্বজাতির কালি-মাখা মুখগুলো। সে মুখগুলির আবাব প্রতিচ্ছবি দেখতে পায এখানের এই মুসলিম ভাইদের পাড়ায় হাঁটলে।···

এখন তারা জোরে কথা বলে না—হাসতে সাহস পায না প্রাণ খুলে। পশ্চিম বাংলার এই ম্রিয়মান মুখগুলো কেবলই মন্মথকে স্মরণ করিযে দেয পূর্ব বাংলার ভুক্তভোগী বন্ধুদের।

অনেকদিন বাদে আবার খোঁজ নেয যতীনের কিন্তু দেখা পায না, ব্যথাও ঘুচাতে পারে না মন্মথ।

তবু দিন কাটে—

অফিস আদালত কাবখানায হৈ চৈ আবেগ আনন্দ···

শুধু ক্লান্ত আমাদের মন্মথ। মুখে তার হাসি নেই, না আছে কোন মন্তব্য। সাবা স্বাধীন ভারতে সকলে যখন মুক্ত সে-ই যেন একা বন্দী হযে বযেছে এক অন্ধ কাবাগাবে।

তবু সে কাজে কামাই দেয না, কুপরামর্শও দেয না কাককে।

মজুরির অভিযোগ নিযে এই দুর্দান্ত বাজাবে এখন একটা সুবিবেচনা করার কথা ছিল। স্বাধীন হলে মালিক একটা কিছু করবেন বলেছিলেন, কিন্তু কেবল করছেন গড়িমসি।

তাই ক্ষুধার্তরা আবাব তোলে ষ্ট্রাইকের কথা।

কিন্তু মন্মথ তার নীতি ত্যাগ করে না। বুঝিযে বলে, 'এখন নয—মানে শিশু বাষ্ট্র, আঘাত কবো না। ববঞ্চ আর কিছুদিন কষ্ট করে দেখো।'

'তুমি তো চিরদিনই বাধা দিয়ে এলে, আর আশা দেখালে। এখন নয়, আবার কখন ?'

'থামো লতিফ, শোনো মল্লিক—কত কষ্টই তো করেছ এতদিন—আর একটু সবুর করে দেখো। এ কারখানা কোন হিসাবের কারখানা না হলেও, যদি কাজ বন্ধ করো, ওতেই ক্ষতি হবে নতুন শিশু সরকারের—তোমাদের স্বাধীন সরকারের।'

মল্লিক জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা এখন না হয় তোমার কথাই রাখলাম, কিন্তু আর কত দিন অপেক্ষা করতে হবে ?'

তা তো মন্মথ জানে না। সে তোতাপাখির মত যেটুকু শিখেছে তাই বলেছে। সে মুস্কিলে পড়ে। কি জবাব দেবে তাই ভাবে।

মল্লিক বলে, 'তুমি তো সঠিক কিছু বলতেও পারছ না, অথচ বাধা দিচ্ছ দাদা হয়ে। আমাদের যে ছেলে-পুলে মারা গেল না খেয়ে, রোগে ভুগে। তুমি আমাদের দেড়া বেতন পাও তুমি কি করে বুঝবে ?'

কথাগুলো মর্মে গিয়ে ঘা দেয় মন্মথর।

'তোমরা তা হলে কি করতে চাও এখন ?'

'ষ্ট্রাইক।'

'করবে, করো—আমারও আর আস্থা নেই।'

সকলে সমস্বরে বলে ওঠে, 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ !'

কারখানা কেঁপে ওঠে।

তখনি মন্মথর ডাক পড়ে।

মন্মথ চলে যায়।

ছোট সাহেব জিজ্ঞাসা করেন, 'কি হয়েছে।'

'কিছু না—একটা ভারি লগ্ খালাস করছে লরী থেকে।'

'সত্যি?'

'বিশ্বাস না করেন, বাইরে বেরিয়ে দেখুন।'

ছোট সাহেবের শংকিত মুখে হাসি দেখা যায়। 'তুমি কি আর মিথ্যা বলছ? যাও, কাজে যাও।'

মন্মথ বেরিয়ে আসে একেবারে ঘর্মাক্ত হয়ে।

সেদিন অবশ্য ধর্মঘট সুরু হয় না। ভিতরে ভিতরে প্রস্তুতি চলে।

মন্মথ ভাবে, সে একি করল? আবার সে চিন্তা করে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, যা সে করেছে তা জোর ক'রে করেনি, তার অজ্ঞাতে সহজ ভাবেই এসে গেছে।

বেশ হয়েছে! বেশ হয়েছে!

বাইশ

স্বাধীনতার আনন্দে ছোট সাহেবের মনে যেটুকু দ্বন্দ্ব জেগেছিল, তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সময় সময় মন্মথকে ডাকে। দু একটা বিষয় আলাপ আলোচনা করে নিভৃতে। অন্য কারুর ভাগ্যে এ প্রসাদ বড় একটা জোটে না।

একদিন অত্যন্ত সহানুভূতির সংগে তিনি বলেন, 'তোমাদের বাড়ি তো পাকিস্তানে পড়েছে। তোমার সেখানে কে কে আছে ?,

কে কে আছে! আছে সব। আছে তার বাড়ি ঘর আত্মীয় বন্ধু—শৈশবের স্মৃতি, কৈশোরের ও যৌবনের সুখ দুঃখের ইতিকথা—না আছে কী ? কিন্তু কিছুই বলতে পারে না মন্মথ।

'তোমরা বড় ঘা খেয়েছ—না ? ভাবছ আমাদেরই দোষ—এই শিক্ষিত বর্দ্ধিষ্ণু সম্প্রদায়ের। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা ছিল কি ? সেই জন্যই তো তোমাদের দেশেরও নিরানব্বই জন শিক্ষিত লোক মত দিয়েছিলেন এ বিভাগে।'

আজ মন্মথর মুখে হঠাৎ কথা জোগায়। 'সেই নিরানব্বই জন ছাড়াও তো অগুন্‌তি মানুষ ছিল, তাদেরও তো মত নেওয়া উচিত ছিল ?'

'সময় কই ? তোমরা ভেব না মন্মথ—এখন আর যা-তা করতে সাহস পাবে না পাকিস্তান।'

'হ্যাঁ বাবু—কলকাতার সহর তো নিরাপদ।'

'তুমি বড় শক্ত কথা বলছ। কিন্তু বাংলার কংগ্রেসীরা তোমাদের কোন দিন ত্যাগ করে নিরাপদে থাকতে চায় না। তোমাদের জন্য তারা যে কোন বিপদের সম্মুখীন হতে প্রস্তুত।'

'তার প্রমাণ, তাঁরাই আগে-ভাগে স্ত্রী পুত্র টাকা কড়ি সরাচ্ছেন পশ্চিম বাংলায়। যা ইচ্ছা করুন—গরিব হিন্দু চাপে পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেই বা আপনাদের কী?'

'তোমার তো কোন চিন্তা নেই তুমি তো সপরিবারেই এখানে। যাক ওসব কথা। এই লিষ্টিটা নাও—দোকান থেকে আমি দেখে শুনে সব কিনে দেব, তুমি তা সীতারামের সংগে গিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌছে আসবে। হাই কম্যাণ্ড আনন্দে অর্থ ব্যয় করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু এতবড় একটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল, তার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ আত্মীয় স্বজনকে যদি কিছু উপহারও না পাঠাই তবে কেমন দেখাবে?'

কিছু উপহার বলতে একটা মোটর বোঝাই মাল খরিদ করা হয়। সোনা দানা ফুলের মালা হীরার গয়না কিছুই বাদ যায় না। অফিসে এনে ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেট বাঁধা হয় এবং নাম লেখা হয় কতক চেনা, কতক অচেনা স্ত্রীলোকের।

মন্মথ হাজার গণ্ডা দেবপুরী ঘুরে অবশেষে রাত্রি দুটোর সময় বস্তিতে ফেরে। তার মনে হয় যেন এক যুগ স্বপ্ন দেখে এইবার তার সত্যি সত্যি ঘুম ভাঙল, ফিরে এলো বাস্তবে।

তেইশ

একদিন মন্মথ এসে বলে যে কয়েকটা বেল্ট খারাপ হয়েছে—স্ক্রু কতকগুলো একান্তই বদলান দরকার। নইলে করাতগুলো যে ভাবে চলে হাত পা কেটে যেতে পারে।

সংবাদটা সত্য—একটা সম্যক মেরামত দরকার। এ কথাটা ছোট সাহেব জানতেন কিন্তু আজকাল তিনি নিতান্ত ব্যস্ত। উৎসবের আনন্দটা এখনও পুরাপুরিভাবে উপভোগ করা হয়নি। স্বাধীনতার উপহার-উপঢৌকন পাঠাতে হচ্ছে নানাস্থানে—পার্টি দিতে হচ্ছে প্রিয় বান্ধব বান্ধবীকে। অবশ্য এসব চুপে চুপেই করা হচ্ছে।

'কটা দিন একটু সাবধানে কাজ করো—এই দিলাম বলে মেরামত করে। দেখ না আমি একটু ব্যস্ত।'

মন্মথ আর আপত্তি করতে পারে না। দু চার দিনের ব্যাপার বই তো নয়।

ঝরঝরে করাতের গতির মুখে সাবধান হয়ে কাজ করে সকলে। কারখানা কি এই সামান্য অজুহাতে বন্ধ করা চলে!

কিন্তু মাঝে মাঝে মন্মথ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। মনে পড়ে শত শত হিন্দু মুসলমানের নিষ্প্রভ চোখ, শুকনা মুখ—যেন কত কলংকের কাজ করেছে ওরা···

বেল্ট ঘুরছে, করাত চলছে, একটা সামান্য মাত্র শব্দ···

ক্যাঁচ্…

মন্মথ থামল।

'কেটেছে, কেটেছে, খুন হয়েছে' একটা গণ্ডগোল শোনা গেল। দলবল এসে ঘিরে ধরল হেড মিস্ত্রী মন্মথকে।

বেশি কিছু হয়নি, শুধু বুড়ো আংগুলটা মন্মথর কেটে গেছে একটু।

খবর পেয়ে পেট্রোল পুড়িয়ে ছুটে এলেন ছোট সাহেব বাড়ি থেকে। সমস্ত ঘরোয়া উৎসবের আয়োজন তিনি সেদিনের জন্য তৎক্ষণাৎ বাতিল করে দিলেন। তেমন সাংঘাতিক কিছু ঘটেনি। অবশ্য এর চেয়েও অনেক বেশি কিছু তিনি আশংকা করেছিলেন।

সামান্য একটু আইডোফর্ম কি টিনচার আইডিনেই সারতে পারে এ ঘা। তবু ছোট সাহেব পুরো তিন মাসের মাইনে অগ্রিম দিযেই একেবারে মোটরে চড়িয়ে মন্মথকে তার বস্তিতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আজ ছোট সাহেব নিজেই এলেন মোটর হাঁকিয়ে। যতক্ষণ না আবার বস্তির বাইরে বেরিয়ে গেলেন ততক্ষণ তাঁর নাকে মুখে রুমাল চাপা রইল।

'বাস্তবিক বড় ভালবাসেন ছোট সাহেব মন্মথকে, কি বলো মল্লিক?'

'হেড মিস্ত্রীর ভাগ্য! নইলে কি এই সামান্য আংগুল কাটায় পুরোপুরি তিনমাসের মাইনে অগ্রিম বরাদ্দ হয়?' মল্লিক জবাব দেয়, 'ওর না কেটে আমার একটা আংগুল কাটলে মন্দ হতো না। যে টানাটানির ভিতর দিয়ে দিন যাচ্ছে।'

লতিফেরও হিংসা হয়।

গোলাম মহম্মদ ও নকড়ি করাতের কাজ বন্ধ করে এগিয়ে আসে। আজ আর তাদের কাজে মন বসছে না। তাদের দেখা দেখি আরো চার পাঁচ জন আসে। ক্রমে সকলে।

অমনি ছোট ছোট স্বার্থের কথা উঠতে থাকে—ন্যায্য পাওনা এবং দাবীর।

ধীরে ধীরে তা বৃহত্তর রূপ ধারণ করে—ষ্ট্রাইক।

আজ নয়—আগামী কাল থেকে সুরু হবে।

মন্মথর আংগুল কেটেছে, ও হেড মিস্ত্রী, তার ওপর ছোট সাহেবের পিয়ারের লোক—কিন্তু অন্য কারুর গলা কাটলেও কোনো সাহায্যের ভরসা নেই। এ ধারণা কি না ঠ'কে, না শিখে এমনি বদ্ধমূল হয়েছে?

ওরা বাড়তি মাইনে ও কিছু বোনাসের দাবী পেশ করে পরদিন। 'হুজুর বিবেচনা করুন, নইলে ষ্ট্রাইক।'

ছোট সাহেব অবাক হয়ে থাকেন।

বাইরে শব্দ হয়—জুলুম বাজি—

চলবে না, চলবেনা, চলবে না।

'দাঁড়াও দেখি, কি করতে পারি।'

এমন সময় যদি মন্মথটা থাকত। নিজেকে ছোট সাহেব বড় অসহায় ভাবেন। চাপে পড়ে সপ্তাহ মধ্যে তাঁকে কিছু মজুরী বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিতে হয় এবং একটা বোনাস কালই দেবেন।

ক্ষুদে পুঁজিপতি ছোট সাহেবের কাছে এই নব অর্জিত স্বাধীনতা যেন ভুয়া মনে হয়।

বস্তিতে বসে মন্মথ কিছু কিছু শোনে। তার মনে এ সব যেন ভালই লাগে। যাক—গরিবরা কিছু পেল তো!

মন্মথ ভোগে, কিন্তু ভাল হয় না আংগুলের ঘা। যন্ত্রণা বাড়ে—জ্বর হয় ভীষণ, সেপটিক দেখা দেয় সংগে সংগে। অবশেষে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হয়। কারণ হাতের টাকা তখন প্রায় ফুরিয়ে গেছে।

অপারেশন হয় তিন তিনবার।...

সৌদামিনী মাঝে মাঝে আসে, সে শুধু কাঁদতে জানে, অন্য কিছু বোঝে না। হাসতপাতালের ওষুধ ছাড়াও মাঝে মাঝে দু একটা দামী ওষুধের প্রয়োজন। তা কে এনে দেবে, টাকাই বা কোথায়? এমন সময় জামাইটাও যদি কাছে থাকত! সে বদলী হয়ে গেছে বহু দূরে।

অন্য কেউ বড় একটা দেখতে আসে না। অর্থাভাব এবং যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে মন্মথ একদিন হাসপাতালের একটা মেথরকে ডেকে বলে, 'এই ঝরিয়া, একটা কথা শুনবি, বকশিশ দেব পুরোপুরি দু টাকা।'

'কতদিন হাসপাতালে এসেছ, তোমার জন্য কত মেহনৎ করলাম—দুটো পয়সার বিড়ি ভি খাওয়ালে না—তুমি দেবে দু রূপাইয়া?'

'নারে দেব, দেব। এখন এই আট আনা নে। তুইই হাতে করে টাকা নিয়ে আসবি—তোর দু টাকা কেটে রেখে বাকিটা আমাকে দিস।'

মন্মথ কথায় ঝরিয়া রাজী হয়। বলে, 'চিট্টি-ওট্টি দাও।'

তাকে রমানাথের কাছে প্রথম যেতে বলে দেয়, তারপর যাবে কারখানায়—খাস ছোট সাহেবের কাছে। চিঠি পত্র কিছু লাগবে না। শুধু মুখে বললেই তাঁরা বিশ্বাস করবেন।

ঝরিয়া রওনা হয়।

মন্মথ আজ একটু যন্ত্রণাটা কম বোধ করতে থাকে। মনে মনে একটা ক্ষীণ আনন্দও হয়। দিনটা কাটে প্রত্যাশায়। হাসপাতালে আসা অবধি এমন করে তার দিন কাটেনি।

চারটা বাজল। অমনি তার বুকটা দুরু দুরু করে উঠল। এই তো সাক্ষাতের সময়। একটি দুটি করে সকলেরই আত্মীয় বন্ধু আসছে।

পাঁচটা বাজল, তবু মন্মথকে কেউ দেখতে এলো না। কিন্তু এখনও ঢের সময় আছে। ঝরিয়াই বা আসে না কেন?

ছটার সময় ঝরিয়া এসে খবর দিল: রমানাথ নাকি কি একটা বড় চাকুরী পেয়েছেন লালদিঘির কাছে এক বড় দালানে। সেখানে কি মেথর-মুদ্দফরাসের যাওয়ার কোনো জো আছে? আর তার ছোট সাহেব গেছেন নাকি সিমলা শৈলবিহারে। এখন ঝরিয়ার পাওনার কি হবে?

মন্মথ কিছু বলতে পারে না। সে কটু কথা শোনে ঝরিয়ার। মনের দুঃখে সে আবার জ্ঞান হারায়। প্রলাপ বকে, 'আমরা ভারতবাসীরা স্বাধীনতার তোরণ দুয়ারে। না, না আমরা সাফল্য অর্জন করেছি। বিশ্বাস করছ না আব্বাস? বিশ্বাস করছ না মল্লিকাদি?'

সে দুটো রক্তবর্ণ জিজ্ঞাসু চোখ মেলে চেয়ে থাকে।

ডাক্তার ও নার্স সুমুখে দাঁড়িয়ে।

সে পাগলের মত নার্সের হাত চেপে ধরে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি বলছ সন্ধ্যা?'

ডাক্তারটি বিস্ময়ে চমকে ওঠেন। নার্সের চোখ দুটি যেন ঝাপসা হয়ে আসে।

ঘণ্টাখানেক যেতে না যেতে মন্মথ ভাল করে সংজ্ঞা ফিরে পায়। নার্সের ইসারায় ডাক্তার রোগীর সুমুখ থেকে চলে যান। একটু আবডালে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

'তুমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে, আজ আবার মা হয়ে ফিরে এলে। আমি এখন আর মরব না—কিছুতেই মরব না সন্ধ্যাদিদি। আঃ! একখানা হাত দাও তো আমার গায়।'

সন্ধ্যার ডান হাতখানা নেতিয়ে পড়ে মন্মথর দেহে—ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হতে থাকে মাতৃস্নেহে, পরম আদরে।

'তুমি চুপ ক'রে একটু ঘুমাও, আমি একটু কাজ সেরে আসি।'

সন্ধ্যা ফিরে যাওয়া মাত্র ডাক্তারটি জিজ্ঞাসা করেন, 'ব্যাপার কি?'

প্রায় ঘণ্টা দুই বসে সন্ধ্যা তার জীবনেতিহাস খুলে বলে। একটি কথাও গোপন করে না ডাক্তারের কাছে।

'আমি বৃত্তি খুঁজে পাচ্ছিলাম না—যখন ভেবেছিলাম ও-পথ ছাড়া আর গতি নেই, তখন ওই আমাকে প্রথম বাধা দেয় এবং সাহায্য করে এক ডাক্তার—সে হচ্ছ তুমি।'

আর কিছু বলার আগেই ঘণ্টা পড়ে—মন্মথ ডাকছে। সন্ধ্যা উঠে যায়। 'আসছি, বস একটু।'

রমানাথ এলেন না, ছোট সাহেব কোন খোঁজ নিলেন না—এমনি সময় দেখা গেল যতীনকে। সেই এখন মন্মথর সংসার আগলাচ্ছে, রেশন এনে দিচ্ছে—তদ্বির-তাদাপি করছে সব কিছুর।

ক্রমে মন্মথ ভাল হয়ে ওঠে। কিন্তু একটা হাত তার নুলো হয়ে থাকে। সে একদিন সন্ধ্যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাসপাতাল ছাড়ে। তবু সন্ধ্যা তার সংগে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা করে—সাধ্যমত সাহায্যও করে। কিন্তু সাহায্যের ওপর নির্ভর করে তো একটা সংসার চলতে পারে না। অতএব মন্মথ ঠিক করে যে দেশে যাবে, টিনের ঘরখানা বেচে ফিরে আসবে। তারপর ভেবে দেখবে কি করা যায়। এখন একেবারে খালি হাত—কিছু দিনের জন্য তো সংস্থান চাই।

চব্বিশ

রাস্তা ঘাটে নানা ঝঞ্চাট করে মন্মথ এসেছে। কবার পোঁটলা-পুঁটলিও সার্চ হয়েছে। সৌদামিনী এক সের চিনি এনেছিল সংগে করে। খুলনায় তাই নিয়ে হৈ হল্লা—যেন একটা রিভলবর আবিষ্কার করেছে পাকিস্তানী সৈন্যরা। সাড়ে চার আনা পয়সা মাত্র অবশিষ্ট ছিল মন্মথর কাছে। ছেলেদের খাবার কিনে না দিয়ে ঐ পয়সা দিয়ে খালাস পেল মন্মথ।

বাড়ি এসে যখন উঠল তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। খালপারে যাদের সংগে দেখা হলো তারা আর বেশি কথা বলল না। তাড়াতাড়ি কাজ কর্ম সেরে যেন বাড়ি গিয়ে ঘরে ঢুকতে পারলেই বাঁচে। চোর-চোট্টা যেন দেশে আজকাল কিলবিল করছে। তারা সুযোগ পেয়ে হুজুগে মেতেছে। কামাই দেয় না একটা রাতও। হিন্দু পাড়ায় হয় দশটা ঘটনা, মুসলমান পাড়ায় হয় একটা। কারণ সেখানে জনতা বেশি—আর হিন্দু বাড়িগুলো তো প্রায় ছাড়া। দেশের বর্ধিষ্ণুরা আগেই মান মর্যাদা নিয়ে সরেছে, এখন ডাকু বজ্জাতের ভাগে পড়েছে গরিব সাধারণ—সমাজের অধম অকর্মা যারা।

সেই যোগের অংকের আর একটা লাইন শ্রীবৃদ্ধি করতে এলো স্লো মন্মথ।

মন্মথ দেখল যে খালপারে তার সাধের কংগ্রেস আফিসটি নেই। খালি ভিটেটা হুহু করছে। শুনলো, বাঁশ-বাঁখারি লুট করে নিয়েছে যেন কারা এসে পনরই আগষ্ট রাত্রে।

আরো সংবাদ আছে, বলল বুঁচির মা। তা নাকি মন্মথ দেখতে পাবে বাড়ি গেলেই।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। নৌকা ছেড়ে উঠতেই অন্ধকার বেশ জম-জমাট হয়ে গেল। পথ চলাই দায়।

'মাঝি একটু বাতিটা জ্বালাও।'

'তেল কই যে বাতি জ্বালামু? সন্ধ্যাকাল, এখন আঁন্ধারেই যান মশায়। ডর কিসের? পাকিস্তানে রোশনাই নাই।'

পথ চলাই দায়, তবু, ঠাহর করে করে এগিয়ে চলল মন্মথ ও সৌদামিনী। দু-পাশে দু ছেলে। কাঁধে বোঁচকা-বুঁচকি। ঘন সুপারি বাগের ভিতর দিয়ে রাস্তা। নানা রকম পোকা মাকড় ডাকছে। মাঝে মাঝে জ্বলছে জোনাকী।

বাড়ির উঠানে পা দিতেই ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করে জ্ঞাতি ভাই, 'কে?'

'আমি মন্মথ।'

মন্মথরও কণ্ঠ বাষ্পাকুল।

এ-ঘরের ও-ঘরের বৌরা মানুষের সাড়া পেয়ে ভয়ে ভয়ে তাকায়। এখন যে কেউ কলকাতা ছেড়ে দেশে আসতে পারে তা বিশ্বাসই করতে চায় না।

এ যেন সেই কলকাতার মুসলমান পাড়ার আর এক দৃশ্য। এমন যে শান্ত মন্মথ তারও রাগ হয়, একটা নিষ্ফল আক্রোশে মনটা ভরে ওঠে। সে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

একে একে সবাই নেমে এসে কুশল প্রশ্ন করে। বৌরা ধরে সৌদামিনীকে ঘিরে,—আর যারা দু একজন পুরুষ মানুষ আছে· তারা ধরে মন্মথকে ঘিরে। অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করে।

একে একে উত্তর দিয়ে যায় মন্মথ ও সৌদামিনী। অবশেষে বলে কি কারণে তারা হঠাৎ দেশে ফিরল।

সর্ব কথাই তারা শোনে। যথারীতি প্রবোধ এবং সান্ত্বনা দেয়।

কিন্তু বড় প্রলুব্ধ হয়ে শোনে তাদের স্বাধীন দেশের মহানগরীর কথা—যা আজ স্বর্গের সামিল তাদের কাছে। তারা পাপী—হয়ত কোন দিনই যেতে পারবে না সেখানে। কেবল লুব্ধ হয়েই শুনবে। হয়ত থাকবে মুসলমান হয়ে এই বাপ দাদার ভিটায়।

অনেক শাসায়, চোখ রাঙায় চিঠি লেখে ষণ্ডাগুণ্ডা সংখ্যাগুরুরা।

জ্ঞাতি ভাই জিজ্ঞাসা করে, 'কি হবে মন্মথ ?'

মন্মথ আজ হঠাৎ রাজনৈতিক প্রসংগ থেকে বিদায় নেয়। ক্লান্ত কণ্ঠে বলে, 'জানি নে দাদা।'

'তুইও জানিস নে ! কি বলে তোর কংগ্রেস ?'

মন্মথ কোনো উত্তর দেয় না আজ।

জ্ঞাতি ভাই ক্ষুণ্ণ মনে চুপ করে থাকে।

ঘরে উঠে মন্মথ চেয়ে দেখে যে আকাশের তারা দেখা যায়। চালের টিন নিয়েছে চোরে—কপাটগুলো সব হাঁ করে খোলা পড়ে রয়েছে। বাড়ির সবাই টের পেয়েছে, কিন্তু বাধা দেওয়ার মত শক্ত-পোক্ত মানুষ নেই এ বাড়িতে।

সৌদামিনী সইতে না পারুক মন্মথ এ ধাক্কাও সামলায়।

সে বলে, 'আর কেঁদে করবে কি? ভাগ্যে যা ছিল, তা হয়েছে।'

একটা আলো চেয়ে নিয়ে বাড়ির চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখে মন্মথ। ফিরে এসে জ্ঞাতি ভাইকে জিজ্ঞাসা করে, 'আমাদের শালগ্রাম কোথায়? মণ্ডপই বা কই?'

'শালগ্রাম ঘরে এনে রেখেছি,—ঐ তো ঠাকুরের আসন। আর বাইরে রাখতে সাহস হয় না। মণ্ডপখানা পূজার সময় ভেঙে এনে ঐ তো আমার শোওয়ার ঘরের কাছে তুলেছি। নইলে সারা রাত্তির মাকে আগলাবে কে? এবার মার বোধন হয়েছে চোখের জলে, বিদায় দিয়েছি, আর এসো না বলে। এ পাপের রাজ্যে যদি কোন আনন্দই না হয় তবে আর দশভুজা এসে করবেন কি? তার চেয়ে এই বিগ্রহ, দেবদেবী সব কলকাতায় নিয়ে যা। আমরা তো যেতে পারব না, দূর থেকে শুনে সুখী হব। শত হলেও আমরা হিন্দু তো।' আবার একটু থেমে জ্ঞাতিভাই বলে, 'হ্যাঁরে কলকাতায় নাকি রাম-রাজত্ব হয়েছে?'

'দাদা, কলিকালে রামই বা কোথায়, আর তাঁর সে রাজত্বই বা কই?'

'হ্যাঁ ঘোর কলিই বটে!'

মন্মথ আবার ঘরে গিয়ে শুয়েছে। ওপরে খোলা আকাশ। কালপুরুষ যেন পাহারা দিচ্ছে এই ভয়ার্ত গ্রামটাকে। অধিক রাত্রি পর্যন্ত ঘুম আসে না। সৌদামিনীও উসখুস করছে। কিন্তু কেউ কথাও বলছে না। এখন নীরবতাই যেন ভাল লাগে।

রাত্রি শেষ প্রহর। হঠাৎ শব্দ হয় চোর চোর বলে। তাঁতি বাড়ি থেকেই শব্দ আসছে। হাঁক ডাক শোনা যায়—শোনা যায় বিরাট হৈ চৈ।

কে যেন মন্মথর উন্মুক্ত ঘরের একখানা ভাঙা বেড়ার পাশে গা ঢাকা দেয়। মন্মথ টের পায়। সে তীব্র উত্তেজনায় উঠে গিয়ে নুলো হাতেই জড়িয়ে ধরে। আজ তার একদিন আর ওর একদিন।

জ্বর তপ্ত শীর্ণ দেহের স্পর্শেই চিনতে পারে মন্মথ। 'আব্বাস? তুই?'

ইতিমধ্যে সৌদামিনী বাতি জ্বালায়। সে থর থর করে কাঁপছে।

'তুমি মন্মথো? মিতা বাড়ি আইছো? তোমার হাতে হইছে কী? হায়রে খোদা!'

মন্মথ চেয়ে দেখে আরও বৃদ্ধ হয়েছে ক্ষুধার্ত আব্বাস—এ তার অকাল বার্ধক্য। আরও ঘোলাটে হয়েছে তার দৃষ্টি—এ তার নিদারুণ শক্তিহীনতা।

একে একে আব্বাসের করুণ কাহিনী মনে পড়ে মন্মথর। এখনও তা ঘুচল না।

তাঁতিরা এসে ঘরে ঢুকে সব দেখে যায়।

দু বন্ধুতে মুখোমুখি বসে রয়েছে ম্লান মুখে। তারা আর কিছু না বলে চলে যায়।

নিবতে নিবতে নিবে আসে তৈলহীন দীপ। এখন আর কেউ তেল পায় না পাকিস্তানে। মন্মথকে তবু একটুখানি এই আধ আংগুল শিশি মেপে ধার দিয়েছিল জ্ঞাতি ভাই। সে তেলে আর কতক্ষণ জ্বলতে পারে আলো?

একটা কালো ছায়া পড়ে আব্বাসের মুখে। সে ধীরে ধীরে একটা খবর জানায়। তার মিতা এবং মিতাইন তা শোনে।

বৌ মারা যাওয়ার পর সে আর চুরি-চামারিতে সুবিধা না করতে পেরে গিয়েছিল সৈজদ্দির ভাঁওতায় পড়ে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডে যোগ দিতে। লোভ হয়েছিল তার প্যান্ট আর সবুজ টুপি দেখে। থাকা খাওয়া মাগনা, মাইনেও দেবে নাকি একটা। কাজ শুধু ষ্টীমার ঘাটে দাঁড়িয়ে হিন্দু যাত্রীদের বোঁচকা পেঁটারা তল্লাস করা—সংগে মেয়েলোক থাকলে বেফাঁস বেপর্দা কথা বলা। ওতেই কাজ হবে—ঘুষ পাবে প্রচুর। সৈজদ্দি মৌলভী ছাহেব বুঝিয়েছিল—এটা তাদের আজাদী পাকিস্তানের এই নতুন পুলিশ দলের 'হালাল' পয়সা। কাফেররা তো পালাবেই। তবু দেশের আজাদী গার্ডেরা কিছু রাখতে পারলে দেশের পয়সা দেশে থাকবে। কিন্তু ঘুষটা জমা রাখতে হবে ঘাটের ছালারে-সুব্বা-ছাহেবের কাছে। বখরা হবে মাস কাবারে। সৈজদ্দি মৌলভী নিজেই নাকি সেই ছালারে-সুব্বা-ছাহেব।

চালের দাম চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। এ সময় এই ছ্যাচড়া চুরি থেকে এ পুলিশি চাকরীর প্রস্তাবে, আব্বাস কেন, থাকলে ওর বাবাও রাজী না হয়ে পারত না। অতএব সে প্যান্ট ও টুপি পরে। নিজের হাতে ডোঙা নাও বেয়ে মৌলভী ছাহেবকে নিয়ে যায় ষ্টীমার ঘাটে। মৌলভী না তো স্বয়ং পীর ছাহেব যেন—এমনি সম্মান দেখায় আব্বাস। সংগে যায় আর একটি অধম রতন মোল্লা। ওটারও বাড়িতে এই দু ওক্তো উনুন জ্বলেনি। ওটা মেছো—সুতার অভাবে ওরও পেশা ঘুচেছে অনেক দিন।

মন্মথ অবাক হয়ে শোনে।

ওরা অনেক মেয়েলোকের গায়ও হাত দিয়েছে, অশ্লীল কথাও বলেছে হুকুম মাফিক—ফলে হিন্দু ভাইরা তাদের মা বোনের মান ইজ্জতের জন্য গয়নাগাঁটি ফেলে পালিয়েছে। সব রকম অন্যায় সে করেছে—এই লোভে যে একবার একটা মোটা কিছু পেলেই সে-ও পালাবে এ হারামজাদা কাজ ছেড়ে। তার মনটা অনেক আগেই নাকি পালিয়ে গেছিল মা মরা ছেলে মেয়েগুলোর কাছে। তারা নিশ্চয় উপোষ করছে শুকনা ভিটায়। ভিক্ষা করে কি তার এখন দিন চলে! দেবে তো হিন্দুরাই। তারা তো এখন দিন গুনছে কখন হয় জবাইয়ের হুকুম। আর যারা পেরেছে তারা তো অনেক দিন হয় দেশ ছেড়েছে।

আব্বাস দাঁতের ওপর দাঁত রেখে একটা একটা করে দিন গণে। মাসের আর পাঁচটা দিন বাকি।

সৌদামিনী এগিয়ে এসে বসে—মন্মথ তো চুপ করেই শুনছে।

একদিন এই কঠোর কঠিন মাস ফুরায়। কিন্তু মৌলভী ছাহেবকে দেখা যায় না।

তিনি রুমাল নেড়ে সেলাম জানিয়ে চলে গেছেন ঢাকায় না জানি মক্কায়।

নতুন একজন লোক আসে তার জায়গায়। তার নাকি খাস করাচীতে বাড়ি। পাঠান, তাগড়া জোয়ান।

সে প্যাণ্ট ও টুপী খুলে রেখে বিদায় করে দেয় রুগ্ন ও দুর্বল আব্বাসকে এবং রতন মোল্লাকে। ওসব গরু ছাগল দিয়ে নাকি এ কাজ চলবে না। 'শালা ভেতো বাঙালী।'

আব্বাস থামে। রাত শেষ হয়ে আসে। টপটপিয়ে শিশির পড়ে গাছ-গাছালি বেয়ে। মন্মথও নীরব।

অনেকক্ষণ বাদে আব্বাস জিজ্ঞাসা করে, 'কি ভাবছ মিতা ?'

'ভাবছি আমরা স্বাধীন হয়েছি।'

'সবই খোদার ইচ্ছা, বরাতের ফের।'

চিরদিনই বাধা দিয়েছে যতীন কিন্তু আজ বাধা দেয় মন্মথ। 'না, না খোদা নয়, অদৃষ্ট নয়—একটা বিরাট ধাপ্পাবাজি।'

ধীরে ধীরে রাত ভোর হয়ে যায়।

—:০:—

